দাম : বারো টাকা

# স্বস্তিকা

৭২ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা।। ১ জুন, ২০২০।। ১৮ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

মোদী সরকারের আমলে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষায় নতুন সংশোধিত এপিডেমিক আইন — পৃঃ ১৬

আমফান প্রমাণ করেছে রাজ্যের রাজা উলঙ্গ — পৃঃ ৮

## সরকারের ব্যর্থতাই ডোবালো রাজ্যবাসীকে

পরিকল্পনার অভাবেই পরিস্থিতি এত ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে।

—শোভন চট্টোপাধ্যায়

তৃণমূল বিধায়ক এবং কলকাতার প্রাক্তন মেয়র

আগে থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অবস্থা এত খারাপ হতো না।

—সুব্রত মুখোপাধ্যায়

পঞ্চায়েত মন্ত্রী এবং কলকাতার প্রাক্তন মেয়র

# पतंजलि®

*प्रकृति का आशीर्वाद*

## करोड़ों देशवासियों का भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट

# दन्त कान्ति

### दन्त कान्ति के लाभ

- ✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।
- ✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।
- ✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।

**पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है**
**आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए**

पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट एजुकेशनल चैरिटी के लिए समर्पित है

आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।

पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद है, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध है।

# স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১ জুন - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১**

**অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬**

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ১২ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** □ ৪

**পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাক্ষেত্রের ইসলামিকরণ**
□ ডা: আর এন দাস □ ৫

**আমফান প্রমাণ করেছে রাজ্যের রাজা উলঙ্গ**
□ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ৮

**পশ্চিমবঙ্গ এখন শুধুই এক নৈরাজ্য - এক নেই-রাজ্য**
□ সুজিত রায় □ ১০

**আমফান ঘূর্ণিঝড়েও রাজ্যের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হলো**
□ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১২

**আমফানেও বাঙ্গালি বিদ্বেষের জিগির তুলে পশ্চিমবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস** □ অভিমন্যু গুহ □ ১৪

**মোদী সরকারের আমলে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষায় নতুন সংশোধিত এপিডেমিক আইন** □ ধর্মানন্দ দেব □ ১৬

**চীনের স্বরূপ প্রকাশিত হচ্ছে, মোহভঙ্গ হচ্ছে পাকিস্তানের**
□ বাসুদেব ধর □ ১৮

**করোনা মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ**
□ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী □ ২০

**নিজ স্বার্থে ডুবে থাকা আগামী পৃথিবীতে আত্মনির্ভরতাই ভারতের টিকে থাকার একমাত্র পথ**
□ স্বপন দাশগুপ্ত □ ২২

**লকডাউনের অন্য দিক : প্রকৃতির পরিবর্তন**
□ গৌতম কুমার মণ্ডল □ ২৪

**হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি**
□ প্রবাল □ ২৬

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## বিপর্যয় মোকাবিলায় ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী

করোনা আক্রমণে যখন সমগ্র দেশ বিপর্যস্ত, সেই সময়ই আমফান নামক ঘূর্ণিঝড় মারণ আঘাত হানিয়াছে এই রাজ্যে। আবহাওয়াবিদরা কহিতেছেন, বিগত এক শতকের ভিতর এইরকম বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় এই বঙ্গের উপর আছড়াইয়া পড়ে নাই। ১৯০৯ সালের আয়লার গতিবেগের তুলনায় এই ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ছিল অতীব তীব্র। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, ১৬৫ থেকে ১৭৫ কিলোমিটার গতিবেগে এই ঘূর্ণিঝড় পশ্চিমবঙ্গে উপকূলবর্তী অঞ্চলে আঘাত করিয়াছে। কলিকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে ইহার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৩০ থেকে ১৫০ কিলোমিটার। এই রকম প্রবল গতিবেগে একটি ঘূর্ণিঝড় আঘাত করিলে কী বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হইতে পারে— তাহা সহজেই অনুমেয়। দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই ঘূর্ণিঝড়ে কার্যত ধ্বংসস্তূপের চেহারা ধারণ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া সুন্দরবন অঞ্চল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, পূর্ব মেদিনীপুর — এই জেলাগুলিতে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। সুন্দরবন অঞ্চলে নদীবাঁধ ভাঙিয়া বহু গ্রাম প্লাবিত বইয়াছে। কয়েক হাজার মৎস্যজীবী-পরিবার সর্বস্বান্ত হইয়াছে। কৃষিকার্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। কয়েক লক্ষ মানুষ গৃহহীন হইয়াছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ঠিক কত— তাহা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমীক্ষক দল যৌথভাবে সমীক্ষা করিবে। তবে, পশ্চিমবঙ্গের এই বিপর্যয়ের দিকে কেন্দ্র সরকার, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেইভাবে পশ্চিমবঙ্গবাসীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী দিল্লি হইতে এই রাজ্যে আসিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গী করিয়া ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। তাৎক্ষণিক ভাবে ১০০০ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্যও ঘোষণা করিয়াছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ সমীক্ষক দল সমীক্ষা করিবার পর আরও অর্থ সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতিও প্রধানমন্ত্রী দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঘূর্ণিঝড়ে মৃতদের পরিবার পিছু দুই লক্ষ টাকা এবং আহতদের পরিবার পিছু পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হইতে দিবার কথাও ঘোষণা করা হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও দিল্লির সরকার যখন এই রকম সহযোগিতা ও সহায়তার আশ্বাস দিয়াছে, তখন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তাঁহার স্বভাবটিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করেন নাই। সকলকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠিবার পরামর্শ বিতরণ করিয়া এই সংকটের সময় তিনি নিজেই সংকীর্ণ রাজনৈতিক মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন। ঘূর্ণিঝড় আমফানে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হইতে পারে ইহা আন্দাজ করিবার পূর্বেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রীকে সহায়তার আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার স্বাভাবসিদ্ধ ঔদ্ধত্যে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ঔদ্ধত্য সহকারে বলিয়াছিলেন, 'আমাদের কাহারো সাহায্যের প্রয়োজন নাই, আমরা প্রস্তুত রহিয়াছি।' কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, কোনো প্রস্তুতিই তাঁহার নাই। কেবল গালভরা ভাষণ ছাড়া তিনি কাজের কাজ আর কিছুই করেন নাই। করোনা মোকাবিলায় তাঁহার ব্যর্থতা যেমন প্রকট হইয়াছে, আমফানের ক্ষেত্রেও তাঁহার ব্যর্থতা ততখানিই প্রকট হইয়াছে। রাজ্যের মানুষ বুঝিয়া গিয়াছেন, ভাষণসর্বস্ব এই মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসন চালাইবার কোনো যোগ্যতাই নাই। নিজের এই ব্যর্থতাকে আড়াল করিতেই তিনি এখন অন্যের উপর দোষারোপ করিতেছেন। কলিকাতা পুরসভার কমিশনারকে বদলি করিতেছেন। সিইএসসি-র বিরুদ্ধে মানুষকে খেপাইতেছেন। বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীদের ত্রাণকার্যে যাইতে বাধা দিতেছেন। এমনকী বিরোধী দলের নির্বাচিত সাংসদ-রা নিজেদের নির্বাচনী ক্ষেত্রে ত্রাণকার্য করিতে গেলেও তাহাদের বাধা দেওয়া হইতেছে। আসলে, পায়ের তলার মাটি সরিয়া গিয়াছে, ইহা বুঝিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইহাও বুঝিয়াছেন তাঁহার বিদায় সমাসন্ন। তাই দাম্ভিক, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী এখন পলায়নের রাস্তা খুঁজিতেছেনে। রাজ্যের মানুষ বুঝিয়া গিয়াছেন, সমগ্র রাজ্যকে এক নরকে পরিণত করিয়া এই মুখ্যমন্ত্রী নিজে বাঁচিতে চাহিতেছেন। কিন্তু সেই সময় আর দূরে নাই, যখন রাজ্যের মানুষ তাঁহাকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠাইবে।

### সুভাষিতম্

*কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।*

*ব্যসনেন তু মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন বা।।*

*জ্ঞানী ব্যক্তিরা কাব্য-শাস্ত্র চর্চার দ্বারা কালযাপন করেন, আর মূর্খেরা খারাপ কাজ, নিদ্রা ও কলহের দ্বারা কালহরণ করে থাকে।*

# পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাক্ষেত্রের ইসলামিকরণ

**ডাঃ আর এন দাস**

তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের ৭৩ বছর পরেও ভারতের হিন্দুরা কি সত্যিই স্বাধীন হতে পেরেছে? কংগ্রেস আর কমিউনিস্টের সম্মিলিত চেষ্টায় মুসলমানের সংখ্যা গোটা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে চলেছে। অথচ হুঁশ নেই কারো। বলুন তো কিসের জন্য সংখ্যালঘু কমিশন? কেন এই তোষণ? হিন্দু হয়ে বেঁচে থাকার অল্প কয়েকটা বছর মুসলমানদের কাছ থেকে কিনে নেওয়ার জন্য কি? আজ দেশের প্রতিটি রাজ্যে আর রাস্তার মোড়ে চাঁদ আর সুতীক্ষ্ণ বেয়োনেটের মতো মিনার সজ্জিত মসজিদের ছড়াছড়ি। প্রতিদিন হিন্দু যুবতীরা মুসলমানদের লালসার শিকার হচ্ছে আর যুবকরা মৃত্যু বরণ করছে তাদের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে। আমরা কেউ জানতেও পারছি না, কারণ সংবাদ সংস্থাগুলোর হিন্দু নামধারী মুসলমান সাংবাদিকরা সামান্য ১৫০০ ডলারের বিনিময়ে সত্যকে মিথ্যার মোড়কে পরিবেশন করছে বিদেশি টিভি চ্যানেলগুলিকে। অন্যদিকে একটা মুসলমান মরলে তা আন্তর্জাতিক সংবাদে পরিণত হচ্ছে। যারা ৪০ কোটি হিন্দুকে মেরে ভারত ভাগ করেছে, তারাই এখন বাকি ভারতকেও গিলে ফেলতে চাইছে, তারা হলো সংখ্যালঘু? বিজেপি সরকার ২০১৮-১৯ সালেও মোট অনুদানের ৮০% মুসলমান, ৭.৫% খ্রিস্টান, ১.৮% বৌদ্ধ, ১% জৈন আর ৪.৭% হিন্দু ছাত্রদের দিয়েছে। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে কেন এই বৈষম্য? ১০০০ বছরের গোলামির পরও কেন এই মানসিকতা? তার মানে কি আমরা হিন্দুরা শেষ হয়ে যাব ধীরে ধীরে? হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতি ও সভ্যতা পরাজিত হবে আরবের ঊষর মরুভূমি থেকে আসা বর্বর আক্রমণকারীদের কাছে? কোথায় গেল শিবাজী আর সম্ভুজী মহারাজের শৌর্য ও স্বাধীনতার পূজারি রাণাপ্রতাপের বীরত্ব?

গত ৯ বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমান ও বামপন্থী গুণ্ডাদের মদতে পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দুশূন্য করার চক্রান্ত করে চলেছেন। মুসলমান ও কমিউনিস্ট পরিচালিত কেরালায় রাষ্ট্রবাদী সাংবাদিক সুধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। কেননা তিনি কাশ্মীরের ‘রোশনি’ নামক জমি-জিহাদের কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। কংগ্রেস পরিচালিত মহারাষ্ট্রে অর্ণব গোস্বামীর বিরুদ্ধে ২৫০টি এফআইআর করা হয়। কারণ তিনি ইতালীয়ান মাফিয়ার কুকীর্তির কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছিলেন। বিহারে ‘ওপইন্ডিয়া’র সম্পাদক অজিত ভারতীর বিরুদ্ধে কেস দেওয়া হয়। কেননা তিনি গোপালগঞ্জে ১৫ বছরের রোহিত জয়সোয়ালকে মসজিদের মধ্যে বলি দেওয়ার চক্রান্তের কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন।

প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছোটোখাটো হাঙ্গামা হচ্ছে। মুসলমানরা হাঙ্গামা করছে, জিতে যাচ্ছে আর নিজেদের অত্যাচারিত বলে সরবে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। প্রশাসন নিষ্ক্রিয়, মুক ও বধির। হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছে ইতিহাস বিকৃত করার খেলা। লকডাউনের আবহে টিভিতে রামায়ণ-মহাভারত দেখানো হচ্ছে যাতে করে মানুষের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা যায়। তাতে অসুবিধা হয়েছে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে কীভাবে শিশুমনে দেশের গৌরববোধকে হীন করে তোলা যায়, তারই পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে, যেটা পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রয়োগ করে তারা ১০০% সার্থক হয়েছে।

মমতার ব্যানার্জির পরোক্ষ মদতে এখন দেশ থেকে হিন্দুসংস্কৃতির শেষ চিহ্নটিকেও নিঃশেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। পাঠ্যপুস্তককে ব্যবহার করা হচ্ছে ধারালো অস্ত্র হিসেবে। প্রাচীন ঐতিহ্যশালী ব্যাবিলন, মিশর, ইরাক ও ইরানের উদাহরণই যথেষ্ট নয় কি? গৌড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য তথা বাংলাভাষা সাহিত্যের পণ্ডিত ড. অচিন্ত্য বিশ্বাসের লেখাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাংলাভাষী ছাত্রদের জন্য উর্দু শিক্ষক

> **বাবা আজ আব্বা, মা আম্মি, পিসি হয়েছেন ফুফা; জল হয়েছে পানি। জলখাবার হয়েছে নাস্তা আর রামধনু হয়েছে রংধনু। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধীরে ধীরে বাঙ্গালি হিন্দুরা কি অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছি? তাই বঙ্গভূমে রামের প্রবেশাধিকার নেই! সরস্বতী পুজার স্থলে নবিদিবস পালিত হচ্ছে!**

নিয়োগ করার বিরোধিতায় দুই তরুণ তাপস ও রাজেশের তরতাজা প্রাণ মমতা ব্যানার্জির পুলিশ ও মুসলমান দুষ্কৃতীরা কেড়ে নেয়। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্রে ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করা হয় একদিনে একজন মুমিন ১০ জন কাফেরকে মারলে ৭ দিনে কত জন মারা যাবে? মমতা সরকারের গ্রন্থাগার মন্ত্রী হলেন মঙ্গলকোট থানার তৃণমূল বিধায়ক কট্টর মুমিন জামাত-উলেমা-ই-হিন্দের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। দ্বিখণ্ডিত ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন মক্কায় জন্মানো উর্দু, পার্সি ও ফার্সি ভাষায় পণ্ডিত, ইসলামিক ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ববিদ মৌলানা মোহিউদ্দিন আবুল কালাম খৈরুদ্দিন-অল- হুসেইনি আজাদ, যাঁর ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে লেশমাত্র সম্পর্ক ছিল না। অতি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপিকা শিরিন মাসুদ 'অতীত ও ঐতিহ্য' নামক ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত ও বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্নোত্তরে লিখেছেন 'রাম' শব্দের সংস্কৃত অর্থ নাকি 'ভবঘুরে'। তা থেকেই নাকি ইংরেজি 'রোম' শব্দটি এসেছে যার মানেও নাকি ভবঘুরে। তাকে সমর্থন জানিয়েছেন,ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল রবীন্দ্রনাথ দে আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের লেকচারার অভীক মজুমদার। মাসুদ, মজুমদারদের বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদনে ষষ্ঠ শ্রেণীর ওই ইতিহাস বইয়ে লেখা হয়েছে, 'ইন্ডো-এরিয়ান ইনভেশন তত্ত্বের' কল্পকাহিনি যা আধুনিক গবেষণায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের দেশে তথাকথিত কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদরা যেমন রোমিলা থাপার, ডিএন. ঝা, বিপান কুমার ও কেরলের সিপিএম নেতা ইরফান হাবিবরা প্রমাণ করতে চান ভারতের মুল অধিবাসীরা তামিল বা কালো চামড়ার লোক ছিলেন। পুরাকালে মধ্যএশিয়ার তৃণাঞ্চলের পশুপালক ও কৃষিজীবীদের একদল খাদ্য আর চারণভূমির সন্ধানে উত্তরপশ্চিম ভাগ দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে। অন্য দলগুলি ইরান ও ইউরোপে প্রবেশ করে উপনিবেশ স্থাপন করে। তারা স্থানীয়দের পরাজিত করে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটায়। তাদের ভাষা ছিল ইন্দো-ইউরোপীয়ান। তার থেকেই নাকি সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি যার সঙ্গে মিল আছে অনেক ভারতীয় ও বিদেশি ভাষার।

তাঁদের তত্ত্ব অনুযায়ী বিদেশি আক্রমমকারী আর্যদের হাতে স্থানীয় অধিবাসীরা পরাজিত হয় বারবার। তাই তার হলো অসুর বা রাক্ষস । তাদেরই দলের একজন নিপীড়িত নিবাসী হলেন রাবণ। ভাবুন, কল্পনার দৌড় কতটা হলে তবেই এমন সব মিথ্যার মোড়কে সাজিয়ে শিশুমনে আমাদের নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করে পরিবেশন করতে পারা যায়। বিজিতরাই নাকি সবসময় ইতিহাস লেখে। পরাজিতরা অবহেলিত থাকে। তাই পরাজিতরা অনার্য, নিকৃষ্ট, রাক্ষস ও অসুর শ্রেণীর হয়। অন্যদিকে বিজেতারা নিজেদের সভ্য, আর্য ও অভিজাত বলে জাহির করে। তাই উত্তরভারত ও দক্ষিণ ভারতের লোকেদের মধ্যে ভাষা ও দৈহিক গঠনের এত অমিল এবং ফলস্বরূপ সংঘর্ষ লেগেই থাকে। ডিএমকে-র প্রয়াত নেতা করুণানিধি বলতেন, রাবণ ছিলেন নাকি স্থানীয় দলিত ও পরাজিত। তার জন্যই, তিনি হলেন রাক্ষস শ্রেণীর। আর বিজেতা রাম ছিলেন আর্য। রামায়ণের লোকেরা নাকি যাযাবর বৃত্তি করতেন। উত্তর ভারত থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের তাড়িয়ে দক্ষিণ ভারতের শেষ সীমানায় সমুদ্রের তটে নিয়ে যাওয়া হয়। তাই বাঙ্গালির সঙ্গে রামের বা রামায়ণের কোনো যোগসূত্রই নেই। সেজন্যই পশ্চিমবঙ্গে মমতার ব্যানার্জির রাজত্বে 'জয় শ্রীরাম' হলো অপরাধমূলক স্লোগান। এই বইটিতে আছে, অতীতে মধ্যএশিয়ার ইরান ও ইউরোপ থেকে আসা লোকেরাই ছিল নাকি যথার্থ আর্য যারা স্থানীয়দের যুদ্ধে পরাজিত করে ভারতীয় উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। যেমনটি করেছিল ১৩০০ বছর পূর্বে শক, হুন, মুঘল ও পাঠানরা। ঠিক তেমনি করেই ৪০০ বছর আগে ইউরোপীয়রা আসে। সুতরাং আজকের ভারতে বসবাসকারী সবাই অর্থাৎ হিন্দু, জৈন, শিখ বা বৌদ্ধ---সবাই হচ্ছেন বহিরাগত। তাদের যেমন অধিকার আছে ঠিক তেমনই আছে মুসলমান বা খ্রিস্টানদের। বইটিতে এও প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, অতীতকালে পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ, 'জেন্দ অবেস্তা' থেকেই 'ঋকবেদে'র নাকি সৃষ্টি। কেননা দুটিকে তুলনা করলে অনেক বিপরীতার্থক মিল পাওয়া যায়। যেমন ঋকবেদের, সাত্তিক গুণসম্পন্ন পরমাত্মাকে 'আহুর' বলা হয়েছে আর তামসীরা হচ্ছেন 'আসুর'।

এই বইটির ৪র্থ অধ্যায়ে 'ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন ইতিহাসধারা' শীর্ষক অলীক গল্পকথায় আছে বিকৃতমস্তিষ্ক প্রসূত অদ্ভুত সব ধারণা। এই সমস্ত অসত্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্যের স্রষ্টারা হচ্ছেন কিছু মিশনারি যারা ভারতে খ্রিস্টধর্মের প্রচারে এসেছিলেন আজ থেকে ৪০০ বছর আগে। তাদের মধ্যে ম্যাক্সম্যুলার ও উইলিয়াম জোনসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধুনা যারা সেই একই কাজ আরও সূক্ষ্ম ভাবে করে চলেছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত ভারততত্ত্ববিদ ওয়েন্ডি ডোনিগার। যার লেখা, 'অ্যাসেটিশিজম ইন দ্য মাইথোলজি অব শিব', 'দ্য অরিজিন অব ইভ্যল ইন হিন্দু মাইথোলজি' ইত্যাদি অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে, যিনি হিন্দু সংস্কৃতি ও দেবদেবীর বিষয়ে অশ্লীল তথ্য আন্তর্জাতিক মহলে প্রচার ও প্রসারে ব্যস্ত থাকেন। তার লেখা পড়লে মনে হয়, তিনি যৌন-অতৃপ্ত


ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

**প্রণব**

পড়ুন ও পড়ান

ফ্রয়েডের এক সুযোগ্য শিষ্যা। আর একজন হচ্ছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত বেদবিশেষজ্ঞ ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শেল্ডন পোলক। ইনি রামায়ণের নাকি আসল তত্ত্ববেত্তা। একটা উদাহরণ না দিয়ে পারছি না। সংস্কৃতে 'নরপুঙ্গব' শব্দের অর্থ তিনি করেছেন বৃষমানব অর্থাৎ মনুষ্যেতর প্রাণী। নর মানে পুরুষ আর পুরুষ মানে বৃষ বা ষাঁড়। কিন্তু এটার আসল তাৎপর্য হচ্ছে নরশ্রেষ্ঠ। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আসলে অর্ধশতাব্দী ধরে এই সব খ্রিস্টান মিশনারিরা হিন্দুধর্মকে হীন দেখিয়ে খ্রিস্টধর্মকে আর ভারতে ইংরাজদের কুশাসন আর শোষণকে মহিমান্বিত করে তোলার আপ্রাণ প্রয়াস করে যাচ্ছেন। নিউইয়র্ক নিবাসী আদিতি ব্যানার্জিই প্রথম বাঙ্গালি বিদুষী আইনজীবী যিনি হিন্দুবিদ্যালয়গুলি অলংকৃত করেছেন হিন্দুনামধারী মার্কসিস্ট ইতিহাসকাররা যাদের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। তাদেরই সুযোগ্য শিষ্য দেবদূত পট্টনায়ক, ভারতের মধ্যে থেকে সমান তালে বিষ ঢেলে চলেছেন। এসব তথ্য বিস্তৃতভাবে জানা যায়, শ্রীরাজীব মালহোত্রার 'ইনভেডিং দ্য সাক্রেড' এবং 'ব্রেকিং ইন্ডিয়া' নামক গবেষণামূলক পুস্তকগুলিতে। কলকাতার জন্য এক ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিত শ্রী সমীর বসুর লেখা থেকে জানা যায়, এইসব তথাকথিত ইতিহাসবেত্তারা ভারতে ১৩০০ বছরের নৃশংস ইসলামিক শাসন ও শোষণের রক্তাক্ত ইতিহাসের পাতাগুলি শান্তি আর সৌহার্দের সাদা চুনকাম করার মহান কাজ নিভৃতে ও নিঁখুত দক্ষতায় নিরন্তর করে চলেছেন। আজ থেকে ৪০০ বছর আগে পর্তুগিজরা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে হিন্দুদের ওপর কী নৃশংস অত্যাচার করে অনেক কালো চামড়ার কেরালাইট জেসুইট তৈরি করতে পেরেছিল, সেটার জীবন্ত দলিল হচ্ছে পর্তুগিজদের গোয়া ইনকুইজিসন।

ইতিহাসকার অনন্ত প্রিয়লকার, টিওটনিও দ্য সুজা এবং চার্লস দেঁলোর লেখা 'গোয়া ইনকুইজিসন' পুস্তকে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ভিনসেন্ট আর্থার স্মিথের লেখা 'দ্য আর্লি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া', রমেশচন্দ্র মজুমদার ও স্যার যদুনাথ সরকারের লেখা ইতিহাস থেকে জানা যায় হিন্দুদের ওপর মুসলমান শাসকদের সেইসব মর্মান্তিক ইতিহাস। যেটাকে আজ বিশেষ প্রক্রিয়ায় চুনকাম করার ঠিকা পেয়েছেন দেশদ্রোহী, বিধর্মীদের পদলেহী ও সংখ্যালঘু ভোটের ভিখারি নিকৃষ্ট শ্রেণীর নেতারা এবং তাদের দলদাস তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাসকাররা। শুনে আশ্চর্য হতে হয়, পৃথিবীর অন্যতম ধনকুবের রথচাইল্ডের জামাতা অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও সেইসব কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে ভারতে 'ইন্ডো-এরিয়ান ইনভেশন তত্ত্বে'র পুষ্টিসাধন করেছেন। যত দিন যাচ্ছে মুসলমান আগ্রাসন তত তীব্র হচ্ছে। ২০১১ সালে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতার মসনদে বসেই স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচি, পাঠ্যতালিকা ও পাঠ্যপুস্তকগুলির আমূল পরিবর্তনের দিকে নজর দিয়েছিলেন যেটা ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারও করতে সাহস পায়নি। পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়ে, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে, এক বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা জামাইতি-ইসলামের কর্মসূচির মধ্যে আছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কি তাদেরকেই অনুসরণ করে সেই কাজকে ত্বরান্বিত করতে চাইছেন!

বাবা আজ আব্বা, মা আম্মি, পিসি হয়েছেন ফুফা; জল হয়েছে পানি। জলখাবার হয়েছে নাস্তা আর রামধনু হয়েছে রংধনু। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধীরে ধীরে বাঙ্গালি হিন্দুরা কি অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছি? তাই বঙ্গভূমে রামের প্রবেশাধিকার নেই! সরস্বতী পুজার স্থলে নবিদিবস পালিত হচ্ছে!

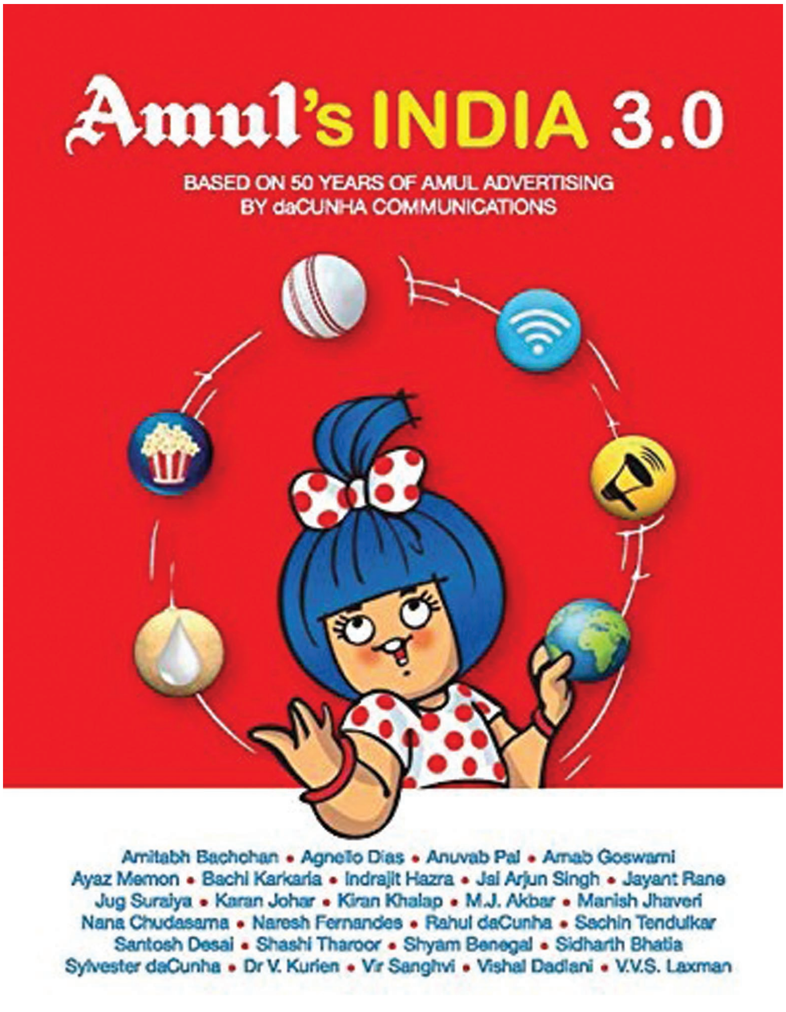

# আমফান প্রমাণ করেছে রাজ্যের রাজা উলঙ্গ

**বিশ্বপ্রিয় দাস**

সোশ্যাল মিডিয়াতে বারে বারেই নেটিজেনরা বলছেন, এই রাজাকে উলঙ্গ বলার ক্ষমতা কারোর নেই। কেউ যদি সামান্যভাবে বলেও ফেলেন, তাহলে তাঁর যে কী অবস্থা হতে পারে সেটা এই ন'বছরে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসী। মাননীয়াকে কিছুই বলা যাবে না। তাঁর পার্ষদদের দোষ বা ত্রুটিও ধরা যাবে না। সমালোচনাও করা তো দূরের কথা! মাননীয়ার অনুপ্রেরণাই আমাদের রাজ্যের কাছে সব। তিনিই প্রথম কথা, তিনিই শেষ কথা, এই সত্যটি জানেন তাঁর দলে ওপরতলা থেকে নীচতলা। তাঁর একটা ভালো গুণ আছে, তিনি সব জানেন। জ্ঞান থেকে বিজ্ঞান, চিকিৎসা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাও তাঁর করায়ত্ত। তাঁর কাছে খাপ খুলতে যাওয়ার ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বরের পিতারও নেই। তিনি অবলীলায় যে কোনো কথা বলতেও পারেন। দুর্জনেরা বলেন, তিনি নাকি ৮০ শতাংশ মিথ্যা, ১৫ শতাংশ সত্য-মিথ্যার মিশেল। আর ৫ শতংশ সত্য। মানুষ তাঁকে খুব বিশ্বাস করেন। এমনটাই ধারণা তাঁর। তাই তিনি এই ধারায় চলতে পারেন। এটাও বলেন, তাঁর বিরোধীরা। কিন্তু করোনা বা সম্প্রতি আমফান সুপার সাইক্লোন! তিনি সমানে বলে চলেছিলেন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তার সরকার সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তত। তিনি জানতেনই না যে, তাঁর নেতৃত্ব যে পরিকাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে, সেটা কতটা ফাঁপা। এই দুটি ক্ষেত্রেই বেআব্রু হয়ে পড়লেন তিনি ও তাঁর নেতৃত্ব।

লেখার শুরু করেছিলাম রাজাকে উলঙ্গ বলবে কে? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে। মিডিয়ার কথাই বলছি। স্তাবক মিডিয়া এখন ব্যস্ত রাজা কতটা ভেঙে পড়েছেন সেটা বোঝাতে। নিঃসন্দেহে আমফান যে ক্ষতি আমাদের দক্ষিণবঙ্গের করে গেল, সেই ক্ষত যে এই শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ংকর, সে কথা অতি নাবালকও স্বীকার করবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী ছুটে এলেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। পাশের রাজ্য ওড়িশাও এগিয়ে এসেছে। সবাই মিলে আমাদের রাজ্যকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার কাজে হাত লাগিয়েছে। কিন্তু সেই আবার ফিরে আসতে হয়, রাজা তোমার কাপড় কই? এই কথাটি বলবে কে? সমালোচনা করতে গিয়ে একটি বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের কী হাল হয়েছে তা সবাই জানে। তাই মিডিয়া চুপ। ফনির মোকাবিলা করেছে ওড়িশা, এই আমফানেরও করল। কিন্তু তাদের ক্ষতি এক লহমায় সামলে নিয়েছে তারা। স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এসেছে জীবন। সে করোনা বা আমফান যাই বলা হোক না কেন। এর পিছনে রয়েছে রাজ্যের প্রশাসক ও তাঁর নেতৃত্বের সুন্দর সমন্বয়ের একটি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। আমাদের রাজ্যে এই বিষয়টি স্বপ্নেও ভাবা যায় না। মাননীয়ার অনুপ্রেরণা না থাকলে, সে পরিকল্পনা আদতেই স্বীকৃতি পাবে না।

আমফান আসবে, এমনটা আভাস ছিল পনেরো দিন আগে থেকেই। সেটা যে কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গমুখী সেটাও আভাষ

দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। সেই অনুযায়ী আমাদের রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য প্রত্যেকটি জরুরি পরিষেবা বিভাগ সেই মতো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে, সেটা তিন দিন আগে থেকেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলছিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রস্তুতি যে শুধুই ফাঁকা বুলি, সেটা প্রমাণ হয়ে গেল আমফানের তাণ্ডবের পর। দেখা গেল, না আছে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দক্ষ কর্মীর দল, না আছে পরিস্থিতির পর জনসাধারণকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেবার মতো কোনো পরিকল্পনা। প্রমাণ হয়ে গেল আমাদের রাজ্যে জরুরি বা আপৎকালীন পরিস্থিতি সামাল দেবার মতো কোনো কিছুই নেই। কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ্যেই সমালোচনা করে একেবারে উলঙ্গ করে দিয়েছেন বর্তমান পুরমন্ত্রী ও কলকাতা পুরসভার সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া মেয়র ও বর্তমান প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমকে। এই পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে আরেক প্রাক্তন মেয়র সুব্রত মুখার্জিও একটু ঘুরিয়ে প্রশাসনের সমালোচনা করতে ছাড়েননি। দুর্জনেরা বলছেন, হয়তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ভেবেছিলেন, ঝড়টা আমাদের রাজ্যকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশে প্রতিবারের মতো আছড়ে পড়বে। কিন্তু ওরা হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে গেছেন, এখনকার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আবহাওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ৯৯ শতাংশ মিলিয়ে দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও কেন এত গাছাড়া ভাব দেখাল রাজ্যের প্রশাসন। সেটা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে সব মহলে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে অনেক আগে থেকেই কেন্দ্র সরকারের তরফে রাজ্যকে সাবধান করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কেন ডাকতে হলো সেনাবাহিনীকে? যদি ডাকতেই হতো, তাহলে একটু আগে কেন ডাকা হলো না? ঝড় থেমে যাওয়ার পরেও বেশ কয়েক দিন কেন অসহায় মানুষকে ধ্বংসস্তূপের মাঝে বিদ্যুৎহীন, জলহীন, যোগাযোগ মাধ্যমহীন হয়ে কাটাতে

হলো? এসব তো দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। ভারতের অন্যতম প্রধান শহরের অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা যে কি ভয়ানক, সেটা সহজেই অনুমেয়। মাননীয়া প্রেস কনফারেন্সে এই পরিস্থিতির সামাল দেবার ক্ষেত্রে লেজেগোবরে হয়ে বলেছেন, তাঁর মাথা কেটে নিতে। বালখিল্যের মতো এই উক্তি। তিনি নিজেকেই নিজে উলঙ্গ প্রমাণ করে দিলেন। অন্যেরা আর বলবে কী!

পুরসভার একটি সূত্র মারফত বেশ কয়েকটি কথা জানা গেছে। কলকাতা পুরসভার এই পরিস্থিতি সামাল দেবার মতো কি পরিকাঠামো আছে, সেটাই জানা নেই বর্তমান প্রশাসকের। কত ম্যান পাওয়ার বা দক্ষ মানুষ কজন আছে, সেটাই জানা নেই। অন্য দিকে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা সিইএসসি কি পরিকল্পনা করেছে, একদিকে যেমন সেটা জানার চেষ্টা হয়নি, অন্য দিকে সংস্থাটিও জানায়নি তাদের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে সে কথাও। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের অবতারণা করতে হয়। শহর কলকাতার যে ক'জন মারা গেছেন, তার সিংহভাগ বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে। অন্য দিকে সেনাবাহিনী এসে গাছ কেটে যেখানে একেবারে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাস্তা পরিষ্কার করে দিল, সেটা কেন পুরসভার কর্মীরা পারল না? অন্যদিকে ওড়িশা থেকে অগ্নিনির্বাপন বিভাগের টিম এসেছে। তারা দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করছে দ্রুততার সঙ্গে। এই দক্ষতা কি আমাদের দমকল বিভাগের কর্মীদের মধ্যে নেই? এর উত্তর সহজে যে পাওয়া যাবে না, সেটা বলাই যায়।

অন্যদিকে রাজ্যের কোনো দুর্গত এলাকায় বিরোধী দলের পক্ষে রাজ্যের সাংসদ যেতে চাইলে, শত শত পুলিশ রাস্তা আটকে তাঁকে যেতে দিচ্ছে না। এতে নাকি পরিস্থিতি রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, সেটাকে আটকাবার জন্য? মাননীয়া এইভাবে আপনি যদি ঝড়ে বিধ্বস্ত হবার আগে ও পরে আক্রান্ত মানুষগুলির জন্য ভাবতেন, তাহলে হয়তো মানুষের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছত না। এই শত শত পুলিশ কর্মীকে দিয়ে কেন গাছ কাটালেন না? কেন ভেঙে পড়া বাড়ি মেরামতের কাজে লাগালেন না? এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি? আর আপনিই বলছেন এই পরিস্থিতিতে রাজনীতি ভুলে একসঙ্গে কাজ করতে। তাহলে আপনি এভাবে বিরোধীদের আটকাচ্ছেন কেন? সেটা কি রাজনীতি নয়? এই প্রশ্নের উত্তর রাজ্যের মাননীয়া থেকে তাঁর দলের মন্ত্রী ও সান্ত্রীদের মুখে শুধু বড়ো বড়ো কথা। আর কাজের বেলায় যে অশ্বডিম্ব, সেটা প্রমাণ হয়ে গেল আরেকবার। আর প্রমাণ হয়ে গেল, আপৎকালীন পরিস্থিতি সামাল দেবার ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে পরিকাঠামো বলে কিছুই নেই। ■

# পশ্চিমবঙ্গ এখন শুধুই এক নৈরাজ্য, এক নেই-রাজ্য

**সুজিত রায়**

২০ মে ২০১১। মহা ধুমধাম করে শহর কলকাতার রাজপথ কাঁপিয়ে মিছিল করে মহাকরণে ঢুকেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশে ইতিহাস সৃষ্টিকরে ৩৫ বছরের জগদ্দল বামফ্রন্ট সরকারকে অবিশ্বাস্যভাবে হারিয়ে রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বসেছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের চেয়ারে। তারপর এক মাসের মধ্যেই তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন—“সব কাজ শেষ করে দিয়েছি। যা যা করার ছিল সব হয়ে গেছে।”

এই লেখাটি যখন লিখছি তখন ক্যালেন্ডারের পাতায় ২৪ মে। টেলিভিশনের পর্দায় সকাল থেকে বারে বারে দেখছি তিনি তাঁর ব্যর্থতা মেনে নিচ্ছেন। পদত্যাগ করছেন না। করবেন না, সেটা জানা। কিন্তু গত ১০ বছরে যে কিছুই হয়নি, তা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিচ্ছেন এই ভাষাতেই ঃ “আমরা নিরুপায়। এত বড় দুর্যোগের মোকাবিলা করতে সময় লাগবে। আমায় আপনারা সময় দিন।”

গোটা শহর কলকাতা অবরুদ্ধ। গত দু’মাস ধরে অবরুদ্ধ করোনা ভাইরাস প্রোথিত লাকডাউনের জন্য। তাঁর সঙ্গে এসে মিশেছে আমফান (অথবা উমপুন) ঝড়ের তাণ্ডব যার গতি ছিল ঘণ্টায় ১৬৫ কিলোমিটার। প্রায় ৬০০০ গাছ উৎপাটিত হয়ে রাস্তায়, বস্তির টালির চালে, ফুটপাতের বাসিন্দাদের ওপর। বিদ্যুৎ নেই, জল নেই, অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগী কেমন আছেন, বেঁচে আছেন না কী মারা গেছেন, তার কোনো খবর নেই। রেশনে চাল নেই, ডাল নেই। গাছ কাটার করাত নেই। কর্মী নেই। হাসপাতালে ডাক্তার নেই, নার্স নেই, ওষুধ নেই। বিদ্যুৎ না থাকার দায় সিএসএসসি-র ঘাড়ে চাপিয়েই খালাস। ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশন লিমিটেড তো সরকারের। তাদের কর্মীরাও ঘরে বসে। জরুরি পরিষেবায় তাদের কাজে নামানোর সরকারি তাগিদ নেই। এত কলকাতা শহরতলির খবর। গ্রামের অবস্থা আরও শোচনীয়। মানুষের মাথায় ছাদ নেই, পেটে দানাপানি নেই। বাঁধ ভেঙেছে শয়ে শয়ে। ক্ষেতে ধান নেই, ফসল নেই, পানীয় জল নেই, পুকুরে মাছ নেই। স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের বইখাতা নেই, গায়ে জামা নেই, প্যান্ট নেই, সব গেছে আমফানে। ঘরে ঘরে

কান্না, পাড়ায় পাড়ায় বিক্ষোভ অবরোধ। বস্তিতে বস্তিতে মুখ্যমন্ত্রী আর মেয়রের বাপবাপন্ত। গোটা পরিস্থিতি প্রমাণ করে সরকারটাই নেই। যে সরকার নাকি এক মাসের মধ্যেই সব করে ফেলেছিল।

সরকার যে নেই তা পরিষ্কার একটা দৃশ্যেই – করোনা ভাইরাসের মহামারীর দিনেও পথে মন্ত্রীরা নেই, এমএলএ-রা নেই, এমপি-রা নেই, কাউন্সিলাররা নেই, আশাকর্মীরা নেই, স্বাস্থ্যকর্মীরা নেই, গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতের সদস্যরা নেই, প্রধান নেই, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা নেই, জেলা পরিষদের সভাধিপতিরা নিশ্চিন্তে ঘরে মুখে মাস্ক বেঁধে ছুটি কাটাচ্ছেন। মূল্যসমেত মাগনার ছুটি কাটাচ্ছেন সব স্তরের সরকারি কর্মীরাও। পুলিশ ছাড়া পথে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। যাঁদের দেখা যাচ্ছে তাদের মুখে স্লোগান, শরীরী ভাষায় বিদ্রোহ। কারও মাথা ফেটেছে, কারও হাত ভেঙেছে, কারও পা ভেঙেছে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে। কোথাও পুলিশের লাঠিতে, কোথাও দিদির ভাইদের সম্মিলিত আক্রমণে। এটা সরকার? নাকি সার্কাস পার্টি?

আমরা সবাই জানি রাতারাতি এত বড়ো দুর্যোগের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কোনকালেই কোনও যুগেই কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা তো ‘মহাশক্তিশালী’, ‘সর্ববিপদহারিণী’ মমতাদিকে দেখতে, শুনতে অভ্যস্ত। যিনি একমাসেই সব করে দিতে পারেন, তাঁর কাছ থেকে এখন কেন শুনব বড়ো বড়ো কথা কিংবা অসহায় অবস্থার কথা? হ্যাঁ শুনব যদি উনি স্বীকার করেন, রাজ্যে পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রচার করেছেন, পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। যদি উনি স্বীকার করেন, উনি রাজ্যের মানুষের সঙ্গে তঞ্চকতা করেছেন, যদি উনি স্বীকার করেন হাসপাতল ভবন হয়েছে, হাসপাতালের পরিকাঠামো গড়া হয়নি। যদি উনি স্বীকার করেন অজস্র স্কুল হয়েছে, কলেজ হয়েছে---শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী প্রয়োজনমত নিয়োগ করা হয়নি। যদি উনি স্বীকার করেন, সামাজিক উন্নয়নের জন্য যত টাকা বরাদ্দ হয়েছে তার সিংহভাগই গেছে কাটমানিতে। বাকিটায় যা কাজ হয়েছে তা দীর্ঘমেয়াদি নয়, ক্ষণস্থায়ী। কারণ ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, পঞ্চায়েতে দিদির পোষ্য ভাইয়েরা, ক্লাবপতিদের পকেট ভরাতে গিয়ে ঠিকাদারদের

জলে দুধ মেশাতে হয়েছে। দুধে জল নয়। ফল হয়েছে করোনায় রোগীরা পরিচ্ছন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থা পায়নি। চিকিৎসাকর্মীরা তাঁদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মাস্ক পায়নি, পিপিই পায়নি। কোটি কোটি মানুষের করোনা টেস্ট হয়নি। কারণ টেস্টের জন্য কিট মেলেনি। আর উন্নয়ন? উন্নয়নের নামে যে কসমেটিক চেঞ্জ হয়েছে বলে এতদিন ধরে সমালোচনা হয়েছে বিভিন্ন মহলে, তা প্রমাণিত হয়েছে। গালে পাউডার লাগালে কিংবা সপ্তাহে তিনবার ফেসিয়াল করে ধসে পড়া উন্নয়ন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা যায় না। ঝড়বৃষ্টি হলেই ধুয়ে যাবে গলে যাবে মেকআপ—এটাই তো স্বাভাবিক। ফেসিয়াল করে চমক দেওয়া যায়, বয়স লুকোনো যায় না। ফলে কলকাতা লন্ডন হয়নি। দার্জিলিং সুইজারল্যান্ড হয়নি। আমরা এই রাজ্য আর রাজ্যের অধিবাসীরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছি। উন্নয়নে পিছিয়েছি, শিক্ষায় পিছিয়েছি, সংস্কৃতিতে পিছিয়েছি, অর্থনীতিতে পিছিয়েছি। এগিয়েছি কীসে? কাটমানিতে, অপসংস্কৃতিতে, ভোটের রিগিং-এ, মস্তানিতে, লেকচারে, মিথ্যা প্রচারে, গা-জোয়ারিতে ও মানুষকে মানুষ না ভাবাতে।

ট্রাফিক সিগন্যালে রবীন্দ্রসংগীত বাজলে যে সাংস্কৃতিক প্রগতি হয় না, তাতে রোদ্দুর রায়দের মতো গিমিকওয়ালাদেরই সংখ্যা বাড়ে, অবিদ্যাপাড়ার মতো লিপস্টিকে লাইটপোস্টগুলিকে এলইডি আলোয় সাজালেই যেমন কলকাতা লন্ডন হয়ে যায় না, নীল সাদা রঙে সরকারি ভবন, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজকে রং করলেই যেমন সামাজিক উন্নয়ন হয় না, তেমনি মুখ্যমন্ত্রী মুখে রুমাল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় গোল দাগ কাটলে বা মাইক হাতে প্রচারে নামলেই করোনা আটকানো যায় না কিংবা এক সপ্তাহ আগে থেকে আমফানের মোকাবিলায় 'আমরা প্রস্তুত' বলে সরকারি বিজ্ঞাপনে মিডিয়া প্রচার করলেই বিপর্যয়কে রোখা যায় না। এর পরেও কি মুখ্যমন্ত্রী বলবেন—আমরা যথাসাধ্য করেছি? এরপরও মুখ্যমন্ত্রী একবারও বলবেন না ভুল করেছি, পাপ করেছি, তার শাস্তি দিন আপনারা?

না, ভুল স্বীকার করার সাহস কিংবা মানসিকতা ওনার নেই। কোনোদিনই ছিল না, তা যদি থাকত তাহলে যোগ্য মন্ত্রীরা গর্তে লুকিয়ে থাকতেন না। যোগ্য অফিসাররা তা তিনি আইএএস কিংবা আইপিএস যাই হোন কেন, ফেউয়ের মতো মুখ্যমন্ত্রীর আঁচল পাহারা

দিতেন না। তা যদি হতো, উনি ক্ষমতায় যথাযথ বণ্টন করতেন যেমন করেছে উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ, দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, বিহারে নীতীশ কুমার। অন্তত শেখার চেষ্টা করতেন। বিপর্যয়ের মোকাবিলা হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কীভাবে করতে হয়। তা যদি হতো, সরকারি কাজে সব প্রশংসাটুকু নিজের আঁচলে বেঁধে রাখার চেষ্টা করতেন না। অন্যদেরও ভাগ দিতেন, দেননি। দেবেনও না, তার জন্য ওনার পরিবার লক্ষ কোটির মালিক হবেন। আর পথের ধুলোয় মৃত্যুর সঙ্গে যুঝবে সাধারণ মানুষ। তা যদি হতো, উনি বুঝতেন, প্রধানমন্ত্রীকে কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরাব বলে আজকের মতো 'বিপদে মোরে রক্ষা কর' বলে প্রধানমন্ত্রীর পায়ে ধরতে হতো না।

ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দেশ। অন্যতম বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ। মা মাটি মানুষকে স্লোগানে আটকে রেখে সস্তার রাজনীতি করলে হবে না। সম্মান দিতে হবে। না, মুখ্যমন্ত্রী সম্মান দেন না। মাটিকে না, মানুষকে না, ভারতমাতাকে না। উনি শুধু ঘুরে মরেন মানুষের মুখে 'মমতাদি জিন্দাবাদ' ধ্বনি শোনার জন্য। আর ক্লাবে ক্লাবে কোটি কোটি টাকা বিলিয়ে রিগিং-এর বিল মেটানোর জন্য। আজ রাজ্যের অবস্থা দেখে মনে পড়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সেই কালজয়ী 'ছন্নছাড়া' কবিতার লাইনটি—

"....কলেজে সিট নেই
কারখানায় কাজ নেই
ট্রামে বাসে জায়গা নেই
মেলায় খেলায় টিকিট নেই
হাসপাতালে বেড নেই
বাড়িতে ঘর নেই
অনুসরণ করবার নেতা নেই
প্রেরণা যোগাবার প্রেম নেই....."

দুর্ভাগ্য পশ্চিমবঙ্গের, দুর্ভাগা বাঙ্গালি। আজ বাঙ্গালি সত্যিই এক নৈরাজ্য, এক নেই-রাজ্যের বাসিন্দা। তাই তো আমাদের আজ খেত নেই, ভিত নেই, রীতি নেই, নীতি নেই, আইন নেই, কানুন নেই, বিষয় নেই, ভদ্রতা নেই, শ্লীলতা-শালীনতা নেই। আমরা সবাই আজ—

"সেচহীন ক্ষেত
মণিহীন চোখ
চক্ষুহীন মুখ
একটা স্ফুলিঙ্গহীন ভিজে বারুদের স্তূপ।"

এ রাজ্যের বর্তমানের গতি নেই, নেই কোনোও ভবিষ্যতের ঠিকানা। কারণ আমরা সবাই এক পাপগ্রহের চক্রাবর্তে ঘূর্ণায়মান। একজনের অনুপ্রেরণাতেই চলে পশ্চিমবঙ্গ। মা মাটি মানুষ সবই অনুপ্রাণিত একজনের অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, অশিক্ষা, অপসংস্কৃতির ঘেরাটোপে বন্দি মানসিকতায়। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একদা রাজনীতিবিদদের প্রশ্ন করেছিলেন—রাজা তোর কাপড় কোথায়?

আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন কী বলতেন? হয়তো বলতেন—'রানি তুই বে আব্রু। অবগুণ্ঠনে মুড়ে ফেল তোর কালোন্ধকার মুখ। ওই মুখ হয়ে যাক অসূর্যম্পশ্যা।'

# আমফান ঘূর্ণিঝড়েও রাজ্যের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হলো

মেলা-খেলা-অমুকশ্রী- তমুকশ্রীর পিছনে কোটি কোটি টাকা বেরিয়ে গেছে রাজ্য সরকারের। কিন্তু সুন্দরবনের নদীবাঁধগুলি পাকাপাকি করে গড়ে তোলার যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়ার দরকার ছিল তা নেওয়া হয়নি। বিপর্যয় মোকাবিলায় যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনা দরকার ছিল তা হয়নি। হাসপাতালগুলিতে শুধু নীল সাদা রং করে সুপার স্পেশালিটি বলে চালানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সুপার স্পেশালিটি করার জন্য যে পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার তা করা হয়নি।

**রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

করোনা সংকটের পাশাপাশিই আমফান ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহ তাণ্ডব। এই জোড়া আক্রমণে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন এখন সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত। করোনার থাবা থেকে যখন পরিত্রাণের কোনো রাস্তাই দেখছেন না রাজ্যের মানুষ, তখন তারই পাশাপাশি আমফানের আক্রমণ সবাইকে আরো দিশাহারা করে দিয়েছে। আমফান ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাওড়া ও হুগলিরও এক বিরাট অংশ। রাজধানী কলকাতাও এই ঝড়ের আঘাত থেকে রক্ষা পায়নি। রাজ্যের আবহবিদরা বলছেন, ১৭৭৩ সালের পর এমন বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় এইরাজ্যে প্রত্যক্ষ করেনি। এমনকী, ২০০৯-এর আয়লার তাণ্ডবকেও ছাপিয়ে গিয়েছে এই ঝড়। এই ঝড়ে যে এখন পর্যন্ত কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার এখনো করে উঠতে পারেনি। সুন্দরবন অঞ্চলে নদীবাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা জলপ্লাবিত হয়েছে। কয়েক হাজার মৎস্যজীবী চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষিজমি জলমগ্ন হয়ে কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বহু কাঁচা ও পাকা বাড়ি এই ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। কয়েক লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়েছেন। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রাথমিক অনুমান এই বিধ্বংসী ঝড়ে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এই ঝড়ের চব্বিশ ঘণ্টা পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে ১০০০ কোটি টাকার সাহায্যও দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে।এই ঘূর্ণিঝড়ে মৃত ব্যক্তিদের পরিবার পিছু দু'লক্ষ টাকা এবং আহতদের পরিবারপিছু পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন প্রধামন্ত্রী। প্রধামন্ত্রী বলেছেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে সমীক্ষা চালিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব করার পর প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করা হবে। আমফান দুর্গত এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে নেমেছে। সেনাবাহিনীও বিপর্যয় মোকাবিলায় নেমে পড়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অবস্থা সামাল দেওয়া যাবে এই আশা করাই যায়।

কিন্তু করোনা ও আমফান একটি বিষয় আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। তা হলো, এই রাজ্যের বাক্‌সর্বস্ব সরকারের অপদার্থতা। করোনা সংকটে যখন সমগ্র ভারতের সঙ্গে এই রাজ্যও আক্রান্ত, তখন প্রথমে আমরা দেখেছি রাজ্য সরকারের, প্রধানত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই সংকটকে লঘু করে দেখানোর প্রয়াস। পরে, সংকট যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থেকেছে তখন মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় নেমে চকখড়ির দাগ কেটে প্রচারের আলোয় থাকার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু করোনার মোকাবিলায় রাজ্যে সর্বত্র সফল লকডাউন করার প্রচেষ্টা করেননি। উপরন্তু তথ্য চাপা দেওয়ার নির্লজ্জ প্রয়াস করছেন। ফলত রাজ্যে করোনা সংকট আরও বাড়তে থেকেছে'। ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রীও

আসর ছেড়ে শেষ পর্যন্ত পালানোর রাস্তা খুঁজছেন। আমফানের ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল। দেখা গেল, ভাষণ সর্বস্ব মুখ্যমন্ত্রী কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আমফান নামক ঘূর্ণিঝরটি যে বিধ্বংসী রূপে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে আছড়ে পড়তে চলেছে—সে সতর্কবার্তা আবহাওয়া দপ্তর দু'সপ্তাহ ধরে দিয়ে আসছিল। কাজেই প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পাওয়া যায়নি—একথা রাজ্য সরকার বলতে পারবে না। আবহাওয়া দফতর আরও বলেছিল, এই ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৬৫–১৭৫ কিলোমিটারের ভিতর থাকবে। কলকাতায় এই গতিবেগ হতে পারে ১৩০—১৫০ কিলোমিটার। এই গতিবেগে কোনো ঝড় যদি আছড়ে পড়ে তাহলে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে তা একটি শিশুও বোঝে। এই ভয়াবহতা আঁচ করেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঝড় আসার আগেই মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেছিলেন। কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন তা জানতে চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তার স্বভাবসিদ্ধ ঔদ্ধত্যে তা প্রত্যাখ্যান করেন। মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে বসে বারে বারে বলেছিলেন, আমরা সবরকমভাবে প্রস্তুত আছি। এরপর ঝড় যখন এল, কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে তছনছ করে দিয়ে চলে গেল, তখন বোঝা গেল মুখ্যমন্ত্রী এবং তার প্রশাসন এই বিপর্যয় মোকাবিলায় মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কলকাতা শহরই ৫০০০ এরই বেশি গাছ ভেঙে পড়ল। বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হলো। কলকাতা শহরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ টানা তিন চারদিন বিদ্যুৎ ও পানীয় জল বিহীন অবস্থায় রইলেন। পুরসভা ও প্রশাসনের কোনো তৎপরতাই দেখা গেল না। টালা থেকে গড়িয়া মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালো। সেই বিক্ষোভের সামনে শাসক দলের কাউন্সিলাররা কার্যত গা ঢাকা দিলেন। আর মুখ্যমন্ত্রী আসরে নামলেন বলির পাঠা খুঁজে বের করতে। করোনা সংকটেও এরকম বলির পাঁঠা তিনি খুঁজে বের করেছিলেন। বদলি করেছিলেন খাদ্য সচিব ও স্বাস্থ্য সচিবকে। এবার প্রথমেই বদলি করলেন কলকাতা পুরসভার কমিশনার খালিল আহমেদকে। কিন্তু রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম আড়ালে রয়ে গেলেন। আড়ালে রয়ে গেলেন দমকল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী সুজিত বসু ও জাবেদ খান। এরপর নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে সিই এসসি-র ওপর দায় চাপিয়ে দিলেন। বললেন, কলকাতার বিদ্যুৎ বিপর্যয় সিইএসসি-র কারণে। একবারও বললেন না, ভেঙে পড়া গাছ না সরালে বিদ্যুৎ সংযোগ ফেরানো সম্ভব নয়। আর গাছ সরানোর কাজটা পুরসভার। মুখ্যমন্ত্রীর আর একটি স্বভাব আছে। প্রয়োজন মিটলে তিনি কাছের মানুষকেও আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে পারেন।

সিইএসসি-র চেয়ারম্যান শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে তিনি এবার সে কাজটিই করলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এমন ভান করলেন, যেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে তার সম্পর্কই নেই। সঞ্জীববাবু যেন শুধুমাত্র যেন সিপি এমেরই কৃপাভোগী। অথচ এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সঞ্জীব গোয়াঙ্কাকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশ সফর করেছেন। বিদেশ সফরে গিয়ে সঞ্জীববাবু মমতাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। তার আঁকা ছবি এক কোটি টাকায় কিনেছেন সিইএসসি-র কর্ণধার। মমতা তাকে বঙ্গবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। মমতার ৯ বছরের শাসনকালে সিইএসসি এখানে বিদ্যুতের মাশুল ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। মমতা কোনো আপত্তি করেননি।

প্রশাসন যে পুরোপুরি ব্যর্থ এবার সে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে মমতার মন্ত্রীসভার অন্দর থেকেই। মমতার দুই প্রবীণ মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং সাধন পাণ্ডে অভিযোগ করেছেন, আগে থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। গ্রহণ যে করা হয়নি সে রাজ্যবাসী বিপর্যয়ের পর পরই বুঝেছেন। তিনদিন সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে রাখার পর সেনাবাহিনীকে তলব করা হয়েছে। অথচ পরিকল্পনা থাকলে আগেই সেনা নামিয়ে পরিস্থিতি সামলে দেওয়া যেত।

আসলে সরকারের সমস্যাটি অন্যত্র। এই সরকারের সে অর্থে কোনো অগ্রাধিকার তালিকা নেই। অনুৎপাদক খাতে এই রাজ্যসরকার প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে। মেলা-খেলা-অমুকশ্রী- তমুকশ্রীর পিছনে কোটি কোটি টাকা বেরিয়ে গেছে রাজ্য সরকারের। কিন্তু সুন্দরবনের নদীবাঁধগুলি পাকাপাকি করে গড়ে তোলার যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়ার দরকার ছিল তা নেওয়া হয়নি। বিপর্যয় মোকাবিলায় যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনা দরকার ছিল তা হয়নি। হাসপাতালগুলিতে শুধু নীল সাদা রং করে সুপার স্পেশালিটি বলে চালানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সুপার স্পেশালিটি করার জন্য যে পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার তা করা হয়নি। চালাকির দ্বারা যে মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে এবার বুঝবেন রাজ্যের মানুষ। ■

# আমফানেও বাঙ্গালি বিদ্বেষের জিগির তুলে পশ্চিমবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস

**অভিমন্যু গুহ**

আমফানের তাণ্ডব চলছে, সেই সঙ্গে সক্রিয় হচ্ছে দেশবিরোধী শক্তি— এমন ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল রাজ্যবাসী। এবার তাদের নতুন অস্ত্র হলো সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে কেন আমফানের খবর কভারেজ না করে করোনার খবর করা হচ্ছে। এত গেল বাহ্যিক অভিযোগ। অভিযোগের আসল উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বঞ্চনার ধুয়ো তুলে, পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, যে সর্বভারতীয় মিডিয়ার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ তাদের কর্ণধাররা কিছুদিন আগেও পর্যন্ত এই শ্রেণীর দেশবিরোধীদের কাছে অতি প্রিয় মানুষ ছিলেন তাদের দেশবিরোধিতায় মদত জোগানোর কারণে। আজ পন্থা পালটেছে কিন্তু উদ্দেশ্যের বদল হয়নি। তাই কিল খেয়ে কিল হজম করার মতো দু'পক্ষই পারস্পরিক সহাবস্থানে আছে। আপামর বাঙ্গালির এই জাতীয় মিডিয়াকে চিনে রাখা উচিত, এরা কতটা পশ্চিমবঙ্গ বিরোধী। বিজেপি বিরোধিতার মুখোশ পরে যারা আসলে পাকিস্তান ও চীনের দালালি করে, ভারত বিরোধিতাই যাদের মূল লক্ষ্য। এই টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং মিডিয়া বাদ দিলে আরও বেশ কিছু সর্বভারতীয় মিডিয়া আছে আমফানের সংবাদ গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছিল। হ্যাঁ, তার মধ্যে বর্তমানে টুকরে টুকরে গ্যাঙের চক্ষুশূল অর্ণব গোস্বামীর রিপাবলিক টিভিও আছে। টাইমস অব ইন্ডিয়া নিয়মিত আমফানের সংবাদ দিয়েছে, এমনকী পশ্চিমবঙ্গে কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হযেছে তার বিশদ বিবরণও। তারপরেও এই ঘোলাজলে মাছ ধরা কীসের তাগিদে?

এর উত্তর খোঁজার আগে আমাদের দেখতে হবে এর পেছনে কারা আছে? এর পেছনে আছে একটি নকশালি গোষ্ঠী যারা আপাতত উগ্র আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশ জুড়ে ভাষা দাঙ্গা লাগাতে চায়, মূল উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করা। এদের আরও বড়ো লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে 'স্বাধীন বাংলাস্তান' গঠন করা। এক দশক আগেই এই বাংলাস্তান গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। মূলত পেট্রোডলারের কারবারিরা, আরব সাম্রাজ্যের দালালরা এই পরিকল্পনা করেছিল। লক্ষ্য ছিল আরও একটি জিহাদি ইসলামিক দেশ গঠন করে বাঙ্গালি হিন্দুদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা। সেইমতো বাংলাদেশে জামাত গোষ্ঠী কাজ করে চলেছে। এপার পশ্চিমবঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করছে উপরোক্ত নকশালি গোষ্ঠী। তাদের সবাই চেনে কোনো এক 'পক্ষ' নামে। আরব দুনিয়ার দালালরা এদের প্রত্যক্ষ মদত জুগিয়ে চলেছে।

> যুক্তিবাদের ভেক ধরে কখনো এরা ভারতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি, এমনকী মানুষের সেন্টিমেন্টকে আঘাত করতে উদ্যত। ... কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ উদ্দেশ্য এদের সঙ্গে মেলে, রাজনীতির ব্যবধান যাই হোক। ফলে এই মুহূর্তে 'পক্ষ'দের রাজনৈতিক অবস্থান যথেষ্ট সুদৃঢ়। ১৯৪৭ সালের পদধ্বনি কিন্তু আবার শোনা যাচ্ছে, বরং আরও মারাত্মকভাবে।

এই সংগঠনের প্রধান 'চট্টোপাধ্যায়' পদাধিকারী ব্যক্তিটির সঙ্গে জামাত গোষ্ঠীর দহরম-মহরম অনেকেরই জানা। বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠানের ভিজিটিং ফ্যাকাল্টিও সে। এরা রাজনৈতিক আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছে রাজ্যের শাসকদলকে। প্রথমত, সেই দলের কোনো নীতি আদর্শের বালাই নেই, ক্ষমাতাই টিকে থাকাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিছু মানুষের সেন্টিমেন্টকে অসুদ্দেশ্যে ব্যবহার করে শাসকদলের রাজনৈতিক দুর্বলতা সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছে এরা। কিছুদিন আগে রাজ্যের এক মন্ত্রীর 'ক্যাব : একটি বাঙালি মৃগয়া প্রকল্প' শিরোনামে একটি সভার আয়োজন বুঝিয়ে দিয়েছিল, শাসকদল কাদের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়। এনআরসি, সিএবি, সিএএ বিরোধিতার সময়েও এরা বাঙ্গালি সেন্টিমেন্টের ধুয়ো তুলে পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস নিয়েছিল, কিন্তু সেভাবে যুত করতে পারেনি। তারও আগে এরা ভোটের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু রাজ্যবাসী নির্বিচারে গোহারা করায় উসকানি দেওয়ার পরিকল্পনা আপাতত মুলতুবি রাখতে হয়।

আগেই বলা হয়েছে, এরা প্রত্যক্ষ ভাবে রাজ্যের শাসকদলকে রাজনৈতিক মদত দেয়, ফলে আরও একটা সুবিধা পায়। এদের দুষ্কর্মগুলো অনায়াসে অনুমোদন পেয়ে যায় প্রশাসনের। কিন্তু মতাদর্শভাবে এরা প্রত্যেকেই কমিউনিস্ট, একেবারে উগ্র অতিবাম। অর্থাৎ মাও সমর্থক। চীনের প্রতি দরদ এদের উথলে ওঠে। এই করোনা সংকটকালে সারা বিশ্ব যখন চীনের প্রতি ঘৃণা ছেটাচ্ছে, তখন এরা চীন কত মহান, সে দেশ কেমন সমাজতন্ত্রী-- নিরন্তর এই তত্ত্ব আউড়ে চলেছে সোশ্যালমিডিয়ায়। এদের পূর্বজরা মতাদর্শভাবে এক হলেও যেহেতু সিপিআই(এম) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঢুকে তার সুযোগসুবিধা পুরো ভোগ করছে, তাই এরা তাদের ধান্দাবাজ মনে করত, পোশাকি নাম দিয়েছিল শ্রেণীশত্রু। আজ এদের উত্তরসুরিরা বুঝে গিয়েছে সিপিএমের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটেছে। আজও এদের গণতন্ত্রে আস্থা নেই। তৃণমূলে আশ্রয় নিয়ে এরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে যতটা বিঘ্নিত করা যায় তা করে চলেছে। অর্থাৎ এরা সেই আদি অকৃত্রিম নকশাল যারা ভারতীয় সেনাকে আক্রমণ করাকে তাদের একমাত্র মোক্ষ বলে মনে করে, অনেকটা জিহাদিদের 'হুর' প্রাপ্তির মতো। আজ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাপ্রেমের মুখোশ পরে কী একটা 'পক্ষ' নাম নিয়েছে। মাঝে মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত যে এদের মধ্যে বাধে না তা নয়। তবে দেশবিরোধিতার প্রশ্নে এরা এককাট্টা।

একটা জিনিস বুঝতে হবে। এরা আরব দুনিয়ার স্বার্থে পরিচালিত হয়। তাই এদের উদ্দেশ্য হিন্দুস্বার্থের পরিপন্থী, আরও একটা ইসলামিক দেশ নির্মাণই এদের লক্ষ্য। এরা জাতে বামপন্থী। আর বামৈস্লামিক শক্তি বঙ্গভূমির কতটা সর্বনাশ করতে পারে তার সাক্ষী আমরা হয়েছি ১৯৪৭ সালে। এখন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। কারণ বাংলাপ্রেমের মুখোশ পরে নিয়েছে এরা। খেয়াল করলে দেখা যাবে, কয়েক বছর যে ধুয়ো উঠেছে বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা নাকি আকবর; গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক নয়, তা এদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। এর সপক্ষে রয়েছে শুধু অপযুক্তি যার কোনো বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তবু প্রচার চলছে জোরদার। এই পক্ষের কেউ কেউ আবার কারিগরদের নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে রটাচ্ছে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর ছিলন কারিগরদের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। তারপর থেকে নাকি তাদের অবস্থা পড়তির দিকে। এমনতর নানা কিসিমের নকশাল 'পক্ষ'অবলম্বনই হয়ে হিন্দুরাষ্ট্রের জুজু দেখিয়ে আপামর বাঙ্গালিকে পথভ্রষ্ট করে চলেছে। ইসলামিক দেশ গঠনের পরিকল্পনাটা এবার স্পষ্ট হচ্ছে তো?

গিরগিটির চাইতেও দ্রুততায় রং পালটানোর ক্ষমতা রাখে এরা। তাই যুক্তিবাদের ভেক ধরে কখনো এরা ভারতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি, এমনকী মানুষের সেন্টিমেন্টকে আঘাত করতে উদ্যত। লকডাউন কালে আমরা তা বার বার দেখেছি। তাই এদের সম্পর্কে সমগ্র ভারতীয়, বিশেষ করে হিন্দু বাঙ্গালির বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। রাজ্যের বর্তমান শাসকদল 'দুধেল গাই'দের যেমন চটাবে না, সেই একই কারণে এদেরকে হাতে রাখতে চাইবে। কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ উদ্দেশ্য এদের সঙ্গে মেলে, রাজনীতির ব্যবধান যাই হোক। ফলে এই মুহূর্তে 'পক্ষ'দের রাজনৈতিক অবস্থান যথেষ্ট সুদৃঢ়। ১৯৪৭ সালের পদধ্বনি কিন্তু আবার শোনা যাচ্ছে, বরং আরও মারাত্মকভাবে।

# মোদী সরকারের আমলে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষায় নতুন সংশোধিত এপিডেমিক আইন

**ধর্মানন্দ দেব**

১৮৯৭ সালের শতাব্দী প্রাচীন মহামারী আইন সংশোধনীর জন্য কেন্দ্রের বর্তমান মোদী সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারি করে গত ২২ এপ্রিল। কারণ মারণ ভাইরাস করোনা আক্রান্তদের বাঁচানোর কোনো যাঁরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্নভাবে হামলার শিকার হচ্ছেন। করোনা আবহে চিকিৎসক সহ সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীর সুরক্ষা দেওয়া সরকারের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। আর তাদের সুরক্ষার জন্যই সরকারের এই অর্ডিন্যান্স। তাই সংকটকালে সরকারের এই অর্ডিন্যান্স শুধু সমর্থনযোগ্যই নয়, প্রসংশার দাবি রাখে। কেননা আমাদের দেশে এমনিতে চিকিৎসক সংখ্যায় কম। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশে চিকিৎসক তৈরির ভালো পরিকাঠামোও তেমন নেই। ভারতে প্রতি ১,০০০ জন পিছু নেই একজন ডাক্তারও। মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুসারে এই মুহূর্তে ১০,২২,৮৫৯ জন চিকিৎসক রয়েছেন। তাঁরা যদি রোজ ৮০ শতাংশ পরিষেবাও দেন, তাহলে প্রতি ১,০০০ জন পিছু ০.৬২ জন চিকিৎসক পাওয়া যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে অস্ট্রেলিয়ার এই হার প্রতি হাজারে ৩.৩৭৪ জন, ব্রাজিলে ১.৮৫২ জন, চীনে ১.৪৯ জন, ফ্রান্সে ৩.২২৭ জন, জার্মানিতে ৪.১২৫ জন, রাশিয়াতে ৩.৩০৬ জন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২,২৫৫৪ জন। এমনকী পাকিস্তানও এক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে এগিয়ে। প্রতি হাজার জনে ০.৮০৬ জন। একদিকে আমাদের দেশে ডাক্তারের সংখ্যা কম, তার উপর করোনা সংক্রমণের পরীক্ষা করতে গিয়ে সেইসব যোদ্ধা, যাঁরা মৃত্যুকে উপেক্ষা করে চিকিৎসা করে যাচ্ছেন, সেই চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি অমানবিক আচরণও লজ্জায় মাথা হেট করে দিচ্ছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে শারীরিকভাবে ক্লান্ত, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত চিকিৎসক, নার্স তাঁর একমাত্র আশ্রয় ও বিশ্রামস্থল, তাঁর গৃহে ফেরার পর কী দেখছেন? দেখছেন তাঁর এতদিনকার পরিচিত প্রতিবেশী হুমকি দিচ্ছেন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে। ফতোয়া জারি করছেন লিফট, কমন প্লেসগুলি ব্যবহার করা যাবে না! দরজা বন্ধ করে দিচ্ছেন মুখের ওপর। শুধুমাত্র করোনার রোগীর চিকিৎসা করেছেন বলে মার খেতে হচ্ছে চিকিৎসক ও নার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের! হ্যাঁ, চেন্নাইয়ের মতো শহরে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছে এক চিকিৎসককে। ওই চিকিৎসককে কবর দেওয়ার সময় স্থানীয় মানুষ বাধাও দেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনগণের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন স্বাস্থ্যকর্মীদের কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁর আর্জিতে সাড়া দিয়ে দেশবাসী কাঁসর, ঘণ্টা, থালা, বাটি, শঙ্খ বাজিয়ে এবং হাততালি দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে সেটা পালন করেছেন। কিন্তু এই দেশেরই একাংশ এখন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার করছেন। একাধিক রাজ্যের রাজ্য সরকার, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সেলবদের সচেতনতা বার্তা, অনুরোধেও করোনা মোকাবিলায় ফ্রন্টলাইনে থাকা চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর হামলা বন্ধ হয়নি। আর এইসব বিভিন্ন ঘটনার প্রতিবাদ হিসাবে চিকিৎসকদের সংগঠন কর্মবিরতির মতো আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এই বার্তা কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরেও আসে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার অতি সম্প্রতি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীদের উপর হামলা হলে দোষীদের কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্য এই অর্ডিন্যান্স জারি করে ১৮৯৭ সালের এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট বা মহামারী আইনের সংশোধন করে।

১৮৯৬ সালে বোম্বে প্রেসিডেন্সি অধুনা মুম্বাইয়ে প্লেগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ভারতে ১৯৮৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তৈরি করা হয়েছিল ‘দ্য এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট’ বা মহামারী প্রতিরোধ আইন। এই আইনে মোট চারটি ধারা ছিল। আইনের প্রথমেই স্পষ্ট বলা হয়েছে— ‘‘An Act to provide for the better prevention of the spread of Dangerous Epidemic Diseases’’। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই এই আইন প্রয়োগের অধিকার রয়েছে। আইনের দ্বিতীয় ধারায় রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে রোগ ছড়িয়ে পড়া আটকাতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিধি তৈরির অধিকার দেওয়া হয়েছে। নতুন অর্ডিন্যান্স জারি করে যে সংশোধন ওই আইনে আনা হয়েছে তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনগুলি নিয়ে নিম্নে কিছুটা আলোচনা করে নিই। দ্য এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট’ বা মহামারী প্রতিরোধ আইনের ১ নম্বর ধারার সঙ্গে ১(ক) একটি নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে। এই ধারায় তিনটি ‘সংজ্ঞা’ দেওয়া হয়েছে। সংজ্ঞাগুলি জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। প্রথম ‘সংজ্ঞা’-টি হচ্ছে আক্রমণের (act of violence)। মহামারী চলাকালীন সেবা প্রদানকারী স্বাস্থ্য সেবাকর্মীদের বিরুদ্ধে যে কোনও ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত যে ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেগুলি হচ্ছে—অপমানের ফলে স্বাস্থ্য সেবাকর্মীদের জীবনযাত্রার বা কাজের পরিবেশ নষ্ট করা এবং তার দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া। ক্লিনিক প্রাঙ্গণে, ক্লিনিকের অভ্যন্তরে বা অন্য কোথাও স্বাস্থ্য সেবাকর্মীদের জীবনহানি, আহত, আঘাত, ভয় দেখানো বা বিপদ সৃষ্টি করা বা তাদের কাজকর্মে বাধা প্রদান করা। স্বাস্থ্য সেবাকর্মীদের হেফাজত থেকে কোনো সম্পত্তি বা কোনো নথি ক্ষতি বা ধ্বংস করা হলে। এইসব ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে এইগুলো act of violence হিসাবে। দ্বিতীয় ‘সংজ্ঞা’-টি হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবাকর্মী (healthcare service personnel)। এর অর্থ হচ্ছে তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি মহামারী সম্পর্কিত

দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব পালন করার সময় আক্রান্ত রোগীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন এবং তারজন্য সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। এগুলির অন্তর্ভুক্ত সরকারি ও ক্লিনিক্যাল স্বাস্থ্য সেবাকর্মী যেমন ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্যাল কর্মী ও কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার। এছাড়াও মহামারী আইনের অধীনে মহামারীর প্রাদুর্ভাব রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোনও ব্যক্তি ও রাজ্য সরকার নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ঘোষিত কোনো ব্যক্তি। তৃতীয় 'সংজ্ঞা'-টি হচ্ছে সম্পত্তির (Property)। ওই সংশোধিত আইনে সম্পত্তি বলতে বুঝানো হয়েছে ২০১০ সালের Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act অনুসারে স্থাপিত ক্লিনিক। মহামারী চলাকালীন রোগীদের জন্য চিহ্নিত কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশনের সুবিধা এবং মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট। এছাড়াও অন্য যে কোনো 'সম্পত্তি' মহামারীর সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধ রয়েছে স্বাস্থ্য সেবাকর্মীদের।

নতুন অধ্যাদেশ কর্তৃক সংশোধিত আইন অনুযায়ী কোনোও ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর কেউ হামলা করলে তাকে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করা হবে (cognizable and non-bailable)। এফ.আই.আর নথিভুক্ত হওয়ার এক মাসের মধ্যে ওই হামলার ঘটনা নিয়ে তদন্ত শেষ করতে হবে পুলিশকে। একজন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার পুলিশ অফিসারকেই তদন্ত করতে হবে এইসব মামলার। তারপর এক বছরের মধ্যে আদালতকে সাজা ঘোষণা করতে হবে। যদি ওই সময়ের মধ্যে আদালত সাজা ঘোষণা করতে না পারে তবে তার কারণ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। অবশ্য সেই বর্ধিত মেয়াদ ঘোষণা করতেই হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী অর্থাৎ whoever–(i) commits or abets the commission of an act of violence against a healthcare service personnel; or (ii) abets or causes damage or loss to any property আইন অনুসারে তখন ৩ মাস থেকে ৫ বছরের জেল হবে। একইসঙ্গে ৫০ হাজার টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানাও দিতে হবে। ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের গাড়ি ভাঙচুর, ক্লিনিক কিংবা চিকিৎসা কেন্দ্রের ক্ষতিসাধন করা হলে দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে হামলাকারীদের কাছ থেকে। এছাড়াও ছয় পৃষ্ঠার নতুন অধ্যাদেশের শেষ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'সম্পত্তি'-র ক্ষয়ক্ষতি হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বাজারমূল্যের দ্বিগুণ বা ক্ষতির পরিমাণ আদালত যেটা নির্ধারণ করবে সেটাও ক্ষতিপূরণ হিসাবে হামলাকারীকে দিতে হবে। আর যদি আদালত নির্ধারিত মূল্য অভিযুক্ত ব্যক্তি দিতে না পারে তখন এই নতুন অধ্যাদেশে বলা হয়েছে এইরূপ—

"Upon failure to pay the compensation awarded, such amount shall be recovered as an arrear of land revenue under the Revenue Recovery Act. 1980".

**সংশোধিত আইন অনুযায়ী কোনোও ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর কেউ হামলা করলে তাকে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করা হবে (cognizable and non-bailable)। এফ.আই.আর নথিভুক্ত হওয়ার এক মাসের মধ্যে ওই হামলার তদন্ত শেষ করতে হবে পুলিশকে। একজন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার পুলিশ অফিসারকেই তদন্ত করতে হবে। তারপর এক বছরের মধ্যে আদালতকে সাজা ঘোষণা করতে হবে।**

শেষে বলা যায়, ১৮৯৭ সালের মহামারী প্রতিরোধ আইনটি ব্রিটিশ জমানায় হয়েছিল। সেই আইনকে বর্তমান সময়ের উপযুক্ত করে গড়ার জন্যই কেন্দ্রের মোদী সরকার অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ১৯৮৭ সালের মহামারী প্রতিরোধ আইনে সংশোধন করে। এককথায় কেন্দ্রীয় সরকার করোনা মোকাবিলায় ফাঁক রাখতে চাইছে না। আর এই যুদ্ধে স্বাস্থ্যকর্মীরাই প্রকৃত সৈনিক। তাই সৈনিকদের মনোবল ও নিরাপত্তার দিকটাও গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। সম্ভবত সেই উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তড়িঘড়ি করে এই অর্ডিন্যান্স জারি করে। এই অর্ডিন্যান্স আনার আগেও কেন্দ্রের মোদী সরকার ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ৫০ লক্ষ টাকা বিমার ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় গৃহসচিব অজয় ভাল্লা এই অর্ডিন্যান্স রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার আগে এক পত্র লিখে দেশের সবকটি রাজ্যের মুখ্যসচিবদের জানিয়েছেন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসক ও নার্স নিজের এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা নিয়েই কোভিড ১৯-এর বিরুদ্ধে লড়ছেন। নোভেল করোনার বিরুদ্ধে প্রথম সারিতে থেকে লড়াই জারি রাখা এই চিকিৎসকরা আর রোগী দেখতে না চাইলে তখন কী হবে অনুমান করতেও ভয়ে শিউড়ে উঠতে হয়। তাই এখনই সময় নিজেকে সচেতন করার। না হলে অচিরেই একটি সংক্রমণ যা সচেতন হয়েই আটকানো সম্ভব ছিল, তা দেশের প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি মানুষকে সংক্রামিত করবে এমন ভাবে, যা আমরা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি, ভাবতেও চাই না।

*(লেখক বিশিষ্ট আইনজীবী)*

# চীনের স্বরূপ প্রকাশিত হচ্ছে মোহ ভঙ্গ হচ্ছে পাকিস্তানের

**বাসুদেব ধর**

পাকিস্তানের নির্ভরযোগ্য বন্ধু বলে বর্ণিত চীনের কৌশলগত সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে গৃহীত ৬২ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ের চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরে (সিপিইসি) একটি অস্বচ্ছতার প্রমাণ বেরিয়ে এসেছে। খোদ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খনের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি পাকিস্তানে চীনা বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যেখানে দেখা গেছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।

প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে, হুয়ানেঙ শ্যানডং রুইই (পাক) এনার্জি (এইচ এস আর) এবং পোর্ট কাশিম ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (পিকি উই পিসি এল), চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর (সিপিইসি) কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রে তাদের স্থাপনা ব্যয় বাড়িয়েছে। এসব তথ্য জানিয়েছেন হাডসন ইনস্টিটিউটের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার পরিচালক হুসেন হাক্কানি। তিনি ২০০৮ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

পাকিস্তানের জনগণ, যাদের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত চীন, অবাক হয়ে দেখছে, আজ চীনের নির্দয়ভাবে অযৌক্তিক ব্যবসা। পাকিস্তানে সাত দশকের ইতিহাসে গণতন্ত্রের মুখোশ পরে সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতায় এসেছে, তারা সবাই ভারতের বিরুদ্ধে তাদের প্রধান সমর্থনকারী হিসেবে চীনকে দেখিয়ে আসছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে চীন পাকিস্তানকে সাহায্য করার নামে যা করছে তা পাকিস্তানি জনগণের মধ্যে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

কমিটি ফর পাওয়ার সেক্টর অডিট, সার্কুলার ডেট্ রিজারভেশন এন্ড ফিউচার রোডম্যাপ-এ ২৭৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, নিজস্ব বিদ্যুৎ সেক্টরে চীনা কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত ১০০ বিলিয়ন

পাকিস্তানি রুপি (৬২৫ মিলিয়ন ডলার) দুর্নীতির সন্ধান মিলেছে, যার অন্তত এক তৃতীয়াংশ চীনা প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত।

চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর (সিপিইসি) এবং পাকিস্তান সামরিক শক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এবং তার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল অসিম সালিম বাজওয়াকে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর (সিপিইসি)-এর সভাপতি বানানো হয়েছিল।

কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্মাণকালীন সুদ বা ইন্টারেস্ট ডিউরিং কন্সট্রাকশন (আইডিসি) সম্পর্কিত স্পনসরদের ভুল উপস্থাপনা এবং পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ সমাপ্তির বিষয়ে

তৎক্ষণাৎ বিবেচনা না করার কারণে কয়লাভিত্তিক দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অতিরিক্ত স্থাপনা ব্যয়ের জন্য ৩২.৪৬ বিলিয়ন পাকিস্তানি রুপির (আনুমানিক ২০৪ মিলিয়ন ডলার) অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ৪৮ মাসের জন্য এই সুদের ছাড় প্রদান করা হয় এবং এই সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আসলে প্রায় ২৭-২৯ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয় যা সাহিওয়াল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ক্ষেত্রে ৩০ বছরে চিরকালের জন্য বার্ষিক ২৭.৪ মিলিয়ন ডলারের ইকুইটি (রো)-এর একটি বাড়তি রিটার্ন ধার্য করে। ডলারের তুলনায় বার্ষিক রুপির শতাংশের অবমূল্যায়নকে মাথায় রেখে আনুমানিক অতিরিক্ত পরিশোধের পরিমাণ ২৯১.০৪ বিলিয়ন রুপি (প্রায় ১.৮ বিলিয়ন ডলার) দাঁড়িয়েছে।

হুয়ানেং শ্যানডং রুইই (পাক) এনার্জি (এইচ এস আর) দাবি করে নির্মাণকালীন সুদ বা ইন্টারেস্ট ডিউরিও কন্সট্রাকশন (আই ডি সি) একটি দীর্ঘমেয়াদী ঋণের উপর ভিত্তি করে (লিবর + ৪.৫ শতাংশ) হারে নির্মাণকালের হিসাবে করা হয়েছে, যদিও পাকিস্তান সরকার দীর্ঘমেয়াদি কোনো ঋণ নেয়নি। চীনা সংস্থাগুলির লাভের বিশালতা ছিল ধারণাতীত। পাকিস্তানি বিশেষজ্ঞদের কমিটি যে দুটি প্রকল্প পরীক্ষা করেছিল, তাদের সূচনার সময় মূল্য ধার্য ছিল ৩.৮ বিলিয়ন ডলার। কমিটি ৪৮৩.৬৪ বিলিয়ন রুপির অতিরিক্ত খরচ পেয়েছে, যা বর্তমান বিনিময় হারে ৩ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে হুয়ানেং শ্যানডং রুইই (পাক) এনার্জি (এইচ এস আর)-কে ৩৭৬.৭১ বিলিয়ন রুপি (আনুমানিক ২.৩ বিলিয়ন ডলার) এবং পোর্ট কাশিম ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (পিকি ইউ পিসি এল)-কে ৩০ বছরের বেশি অতিরিক্ত স্থাপনা ব্যয়ের কারণে অতিরিক্ত রিনার্ট এবং ভুল হিসেবের কারণে অতিরিক্ত রিটার্নের পরিমাণে ১০৬.৯৩ বিলিয়ন রুপি (আনুমানিক ৬৭২ মিলিয়ন ডলার) অভ্যন্তরীণ হারের রিটার্নে (ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন) অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হয়েছে।

কমিটি তার প্রতিবেদনে সুপারিশ করে যে পোর্ট কাশিম ইলেকট্রিক পাওয়ার

**“পাকিস্তানের জনগণকে চীনের হিংস্র আচরণের জন্য বিরাট মূল্য দেবার ফাঁদে পড়তে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরেছে, পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব ও চীনের লুটপাটে আর সাহায্য করছে না। তাদের কাছে তথাকথিত ‘পরম বন্ধু’ চীনের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।”**

কোম্পানি লিমিটেড (পি কি ইউ পি সি এল) এবং হুয়ানেং শ্যানডং রুইই (পাক) এনার্জি (এইচ এস আর) এর প্রকল্প ব্যয় থেকে ৩২.৪৬ বিলিয়ন রুপি (আনুমানিক ২০৪ মিলিয়ন ডলার) কেটে নেওয়া হবে এবং রিটার্ন পেমেন্ট ফর্মুলাটি প্রকৃত নির্মাণের সময় পুনরায় প্রকাশ করার জন্য সংশোধন করা হবে এবং পোর্ট কাশিম ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (পি কি ইউ পি সি এল) এবং হুয়ানেং শ্যানডং রুইই (পাক) এনার্জি (এইচ এস আর)-এর ট্যারিফ অনুসারে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে।

বর্তমান সূত্রের অধীনে, পরিচালনার দুই বছরের মধ্যে হাইপোটনিক শক রেসপন্স (এইচ এস আর) ইতিমধ্যে বিনিয়োগকৃত তার মূল ইক্যুইটির ৭১.১৮ শতাংশ পুনরুদ্ধার করেছে, যেখানে পোর্ট কাশিম ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (পি কি ইউ পি সি এল) পরিচালনার প্রথম বছরে তার মূল ইকুইটির ৩২.৪৬ শতাংশ পুনরুদ্ধার করেছে। এখানেই লাভের অঙ্ক শেষ এবং তার উপরে কৌশল ছাড়া সংস্থাগুলি তৈরি হতো। ৬২ বিলিয়ন ডলারের চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর (সি পি ই সি) প্রকল্পে চীনারা যে আয় করবে তা কল্পনা করাও কষ্টকর।

শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ সরকারের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যেতে পারে পাকিস্তান সরকার ও তাদের নেতাদের কারণে কীভাবে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়েছে। পাকিস্তানের অর্থনীতি কিছু সময়ের মধ্যে দেউলিয়া হওয়ার কিনারায় গিয়ে পৌঁছেছে এবং কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটছে। তা সত্ত্বেও উগ্র ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের লালন-পালন এবং ভারতের বিরুদ্ধে হামলায় তাদের মদত দেওয়া পাকিস্তান বন্ধ করেনি।

তাদের দেশের নীতি সংস্কার করার পরিবর্তে পাকিস্তানের নেতারা আবার মহামারীর জন্য ঋণ পুনর্গঠন ও ঋণ মকুবের সুবিধা চেয়েছে, ঠিক যেমনটা তারা আগে সন্ত্রাস দমনে পুরস্কার হিসেবে আন্তর্জাতিক সহায়তা চেয়েছিল। তবে আন্তর্জাতিক মহল আশা করে যে একের পর এক অর্থনৈতিক সংকট থেকে পাকিস্তানকে বারবার মুক্তি দেওয়া অবাস্তব। প্রচুর সামরিক ব্যয়, গভীর দুর্নীতি এবং দায়বদ্ধতার অভাব পাকিস্তানের একটি স্বভাবে পরিণত হয়েছে এবং রাজস্ব ও ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান দিন দিন গভীর হচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে, চীনা বিনিয়োগগুলি তাদের কাছে একটি নতুন দায়বদ্ধতায় পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আই এফ এফ) পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের কর ও শুল্ক বাড়ানোর জন্য চাপ দিচ্ছে। আসলে পাকিস্তানের জনগণকে চীনের হিংস্র আচরণের জন্য বিরাট মূল্য দেবার ফাঁদে পড়তে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরেছে, পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব ও চীনের লুটপাটে আর সাহায্য করছে না। পাকিস্তানের জনগণ এখন ভালো কিছু দেখতে চাইছে। তাদের কাছে তথাকথিত ‘পরম বন্ধু’ চীনের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

# করোনা মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

এটা আমরা সবাই জানি যে করোনা ভাইরাস তার পরিবর্তিত জিন মিউটেশান অতি দ্রুত সংঘঠিত করতে পারে বলে এর প্রতিষেধক বের করা দুঃসাধ্য। ইতিমধ্যেই পাঁচ রকমের করোনা ভাইরাস পাওয়া গেছে। সুতরাং আমাদের শরীরের antigen-anti-body গঠনের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী ও কার্যকরী করলে তবেই আমরা করোনার মোকাবিলায় শক্ত ইমিউনিটি গড়তে সক্ষম হব।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পক্ষপাতমূলক প্রশাসনিক পদক্ষেপের ফলে এই রাজ্যে করোনা রোগী সহ পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থাই ভেঙে যেতে বসেছে। পরিসংখ্যান বলছে, করোনা পজিটিভ রোগীর সঙ্গে মৃতের শতকরা হিসেব মেলালে আমাদের করোনা যুদ্ধে সাফল্যের পরিমাপ করা যাবে। এই হিসেবে পৃথিবীতে আক্রান্তের ৬.৪৬% মৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫.৯৫%, ব্রিটেনে ১৪.২%, স্পেনে ৯.৯৫%, চীনে ৫.১৮% এবং ভারতে ৩.১৫%। এটা প্রমাণ করে ভারত সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে সঠিক সময়ে লকডাউন করে এবং 'শারীরিক দূরত্ব' বজায় ও মুখ-নাক ঢেকে সাধারণ হাইজিন মেনে যে নিয়মাবলী চালু করেছে তার ফলে মৃত্যুসংখ্যা এমন উচ্চ জনঘনত্বের দেশে অনেক কমানো গেছে। ফলে ভারতীয় নেতৃত্ব বিশ্বের দরবারে যথেষ্ট মান্যতা পেয়েছে।

করোনা আক্রান্ত ও মৃত সবচেয়ে বেশি মহারাষ্ট্রে। আক্রান্ত ও মৃতের শতকরা হার ৩.৬২%, গুজরাটে ৫.৭৯%, এমনকী দিল্লিতে ২.৩৬%। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ৮.৮৯%। অভিজ্ঞতার নিরিখে কারণ ব্যাখ্যা করলে যে বিন্দুগুলি উঠে আসে তা হলো রাজ্যে টেস্টিং প্রক্রিয়াটাই অবৈজ্ঞানিক। 'rapid kit' টেস্টের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে পজিটিভ হলে সেটা সঠিক কিন্তু নেগেটিভটা নিশ্চিত নয়। সেটা পজিটিভ হতেও পারে। সেজন্য rtPCR পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ ও বেশি খরচের হলেও তা অনেক নির্ভরযোগ্য। রাজ্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ঠিকই করেছে। সমস্যা অন্য জায়গায়। এই পদ্ধতিতে স্যাম্পল সংগ্রহ থেকে টেস্ট শুরু করার মধ্যে সময় থাকে মাত্র ২ থেকে ৩ ঘণ্টা। এই জায়গায় প্রথাগত কর্মবিমুখ ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচ ও প্রশাসনিক অপদার্থতার কারণে ও ব্যক্তিবিশেষের প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি করার কারণে এই সময়ের পরে যে নমুনাই পরীক্ষা করা হোক তার ফল নেগেটিভ হয়েছে। কিন্তু সেই রোগীদের মধ্যে অনেকের পরবর্তিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় 'Co-Morbidity'-র মতো হাস্যকর তত্ত্ব চালু করার চেষ্টা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব না মানা এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায় বা মদতে সামাজিক সংক্রমণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তৃতীয়ত, জামাতি ও পরিযায়ী শ্রমিকেরা ফেরার পর তাদের সঠিক পরীক্ষা, আইসোলেশন এমনকী সঠিক তথ্যাদি পরিপূর্ণভাবে প্রশাসনের কাছে না রাখা। চতুর্থত, সুসজ্জিত প্রাইভেট কোভিড হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসকের নতুন প্রোটোকল অনুযায়ী কাজ করতে দেয়ার ব্যাপারে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দীর্ঘসূত্রতা। পঞ্চমত, অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক মানুষদের সঠিকভাবে দেখভাল না করে অযথা দুর্নীতি ও পেশীশক্তি প্রদর্শন। এর ফলে করোনা মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতা তাকে রাজনৈতিকভাবেও দুর্বল করেছে।

প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রতিবাদী ভাবমূর্তি গড়ার তাগিদে হাসপাতাল ভাঙচুর ও চিকিৎসক নিগ্রহের লজ্জার ইতিহাস আমাদের আছে। অভিযোগ আছে যে, এইসব ঘটনায় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রং দেখে soft pedaling করার। এরপর রাজ্য সরকারের সঠিক ও পর্যাপ্ত পরিমাণ পোশাক ও PPE কিট এবং যথার্থ N95 না দেওয়ার কারণে বা স্বাস্থ্যভবন নির্দেশিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা চালানোর কারণেই হোক, রাজ্যে করোনা আক্রান্ত চিকিৎসক, নার্স, চিকিৎসাকর্মীর সংখ্যা এত বেশি যে অনেক হাসপাতাল আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যে ৩০ জন চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত। এছাড়া ২ জন চিকিৎসক মারা গেছেন। ৪২ জন নার্স ও ৬৪ জন চিকিৎসাকর্মী যাঁরা খুব কম বেতনে পরিষেবা দেন, তাঁরা করোনায় আক্রান্ত। ফলে এদের অনেকেই আর কাজে আসছেন না। এখনো পর্যন্ত রাজ্য থেকে ৬০২ জন নার্স তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেছেন। এর ফলে রাজ্যে পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থাই ভেঙে যেতে বসেছে। এই ৩০ জনের মধ্যে ১৮ জন চিকিৎসক ও ৪২ জন নার্সের মধ্যে ২৬ জন শুধু শহর কলকাতাতেই আক্রান্ত হয়েছেন।

ভাষণবাজি ও বিভিন্ন করোনা কমিটি গঠন করেই যে রাজ্যের মানুষকে সুরাহা দেওয়া যাবে না তা বোধহয় মুখ্যমন্ত্রীও বুঝতে পারছেন। কিন্তু ঔদ্ধত্যের কারণে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছেন না।

করোনা পরীক্ষার ব্যাপারে সুইডেন যে পদ্ধতি অনুসরণ করে সফল হয়েছে এখানে সেই 'target vulnerable section' formula প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ অনন্তকাল লকডাউন সম্ভব নয়। এই পদ্ধতিতে ৬৫ বছর ও তার ওপরের বয়সের সকলের পরীক্ষা করা ও পজিটিভ রোগীদের চিকিৎসা শুরু করা প্রয়োজন। নেগেটিভদের হোম কোয়ারান্টিনে রাখা এবং সরকারের তরফ থেকে তাদের দেখভালের দায়িত্ব নেওয়া। অন্যদের কাজকর্ম ধীরে ধীরে শুরু করতে দেওয়া ও লক্ষণ দেখা দিলে তবেই টেস্ট করা।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের World Food Programme-এর ডিরেক্টর David Beaslay-র একটি বক্তব্যকে হাতিয়ার করে কমিউনিস্ট ও তাদের তল্পিবাহকরা চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে যে দেশে অবশ্যম্ভাবী দুর্ভিক্ষ এসে গেল। BBC বলেছে, David Beaslay বলেছেন যে এই দুর্ভিক্ষে সাড়ে তেরো থেকে পঁচিশ কোটি লোক প্রভাবিত হবে। কিন্তু আসল রিপোর্টটা পড়লে বোঝা যায় যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা যে দশটি দেশের তার ন'টি দেশই আফ্রিকার ও অন্যটি সিরিয়া। এই দেশগুলিতে খাদ্য সুরক্ষার শক্তিশালী স্কিম নেই। উপরন্তু এই দেশগুলির অধিকাংশই দুর্ভিক্ষপ্রবণ ও তারা খাদ্যের জন্য অন্যদেশের মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল।

আমাদের দেশে করোনার কারণে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ক্ষতি হয়নি। উপরন্তু এবছর তুলনামূলকভাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার লকডাউনে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ছাড় দেওয়া ছাড়াও সরকারের খাদ্য সহায়তা প্রকল্পগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষদের কাছে উপযোগী। বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে সরকার প্রান্তিক মানুষদের হাতে কিছু নগদের জোগানের ব্যবস্থাও করেছে। লকডাউন পর্ব লঘুকরণের পর্যায়ে প্রান্তিক মানুষরা ধীরে ধীরে তাদের কাজে ফিরে যেতে শুরু করেছেন। ভোগপণ্যের চাহিদা ও উৎপাদনের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই।

দেশে রেকর্ড পরিমাণ চাল ও গম উৎপাদন হয়েছে। FCI-এর গুদামগুলিতে ঘাটতি নেই। কিন্তু আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতি ভিন্ন। গত বছরের তুলনায় এ বছর আলুর উৎপাদন ১৪% বৃদ্ধি পেলেও দাম বৃদ্ধির কারণ এখানের জটিল বণ্টন ব্যবস্থা। হিমঘর, সিন্ডিকেট ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যেও শাসকলালিত কাটমানি শিল্পের দৌলতে রাজ্যসরকারের সংগ্রহমূল্য কিলোপ্রতি ৫ টাকা হলেও ৭০% এর উপর আলু কিলোপ্রতি ৮ টাকার কমে চাষিরা বেচেছেন। আর সেই আলু উপভোক্তারা এখনই কিলোপ্রতি ২০-২৫ টাকা দরে কিনছেন। এটা নিশ্চিতভাবেই শাসকের ব্যর্থতা। আনাজপাতি ও অন্য পণ্যের ক্ষেত্রেও রয়েছে কাটমানি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য।

এরসঙ্গে রেকর্ড অনুযায়ী জানা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গত বছর চাল সংগ্রহের পরিমাণ ২২% মাত্র। সরকারের স্বীকৃতি অনুযায়ী এই রাজ্যের গণবণ্টন ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত। 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' ব্যবস্থায় এই দুর্নীতি রুখতে প্রশাসনের ব্যবস্থা থাকলেও রাজ্যসরকারের তাতেও অনীহা। একমাত্র দুর্নীতিমূলক প্রশাসন স্বচ্ছ ও সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে চলা সরকারই রাজ্যবাসীকে এই দুরবস্থা থেকে রেহাই দিতে পারে।

*(লেখক পশ্চিমবঙ্গ বায়োটেক ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের পূর্বতন উপদেষ্টা ও নির্দেশক)*

*অতিথি কলম*

স্বপন দাশগুপ্ত

# নিজ স্বার্থে ডুবে থাকা আগামী পৃথিবীতে আত্মনির্ভরতাই ভারতের টিকে থাকার একমাত্র পথ

**এই চ্যালেঞ্জ একাধারে অর্থনৈতিক, মানবিক ও বৌদ্ধিক স্তরে মোকাবিলা দাবি করে। বিশ্বের উদ্যোগপতিদের কেবল ‘ভারতে উৎপাদন করো’ বলে আবাহন করে আনলেই হবে না, তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমাদের ভারতে তৈরি জিনিসের উৎকর্ষের জন্য যেন গর্বও জন্মায়।**

১৯১৪ থেকে ১৮ সাল পর্যন্ত চলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ২ কোটি মানুষের জীবনহানি হয়েছে। সে সময়ের নিরিখে এই মৃত্যু সংখ্যার অভিঘাতে গোটা আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভিমুখটিই সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে উঠে আসতে থাকে। এই দিশা বদলের ভয়ংকর পরিণতি দেখা যায় ২১ বছর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সূচনায়। তখন হঠাৎ তৎকালীন বিশ্ব ক্ষমতার ভরকেন্দ্রগুলিতে আমূল পরিবর্তন নজরে পড়ে। তবুও ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে শুরু হওয়ার সময় ইউরোপ জুড়ে অভূতপূর্ব উন্মাদনা শুরু হলেও খুব কম লোকেই আন্দাজ করতে পেরেছিল কতটা ধ্বংসাত্মক হতে চলেছে এর পরিণতি। হায়! এখনকার চিরাচরিত ধারার পণ্ডিতরা বিশ্বাস করে তৃপ্তি পেয়েছিলেন যে, ছেলেরা ক্রিসমাস পড়লেই সব ঘরে ফিরে আসবে।

ইতিহাস হয়তো এই চলতি বছরে নিজের পুনরাবৃত্তি করতেও পারে, নাও পারে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন যাকে এক ‘শয়তানসম অসুস্থতা’ বলে আখ্যা দিয়েছেন তার প্রভাবে বিশ্বের অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে হয়তো আবার এক পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ এসে উপস্থিত হয়েছে। কিংবা আর এক ইতিহাসবিদ টেলরের কথায় ‘আবার এসেছে ইতিহাসের বাঁকের ঘুম, যখন ইতিহাস কিন্তু মোড় ঘোরাতে মোটেই রাজি নয়।’ কিন্তু লক্ষণগুলি নিঃসন্দেহে বিপদসংকেত। গত সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জানিয়েছে, পৃথিবী হয়তো ২৫ মার্চের আগের জায়গায় আর ফিরে যাবে না। সেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রার রূপ হয়তো বদলে যাবে। একথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে WHO জানায়, এই কোভিড ভাইরাস-১৯’ হয়তো আমাদের জীবনের সঙ্গী হয়েই আর ৫টা ভাইরাসের মতোই থেকে যাবে। কখনই নিশ্চিহ্ন হবে না। তাই এক অজানা আতঙ্ক আজ ঘিরে ধরছে যে, যদি-না বিজ্ঞানী ও গবেষকরা এক আশ্চর্য প্রতিষেধকের এর সন্ধান না পান তাহলে বিশ্বকে এক চিরস্থায়ী সংক্রমণের আশঙ্কা নিয়েই চলার নিয়তিকেই মেনে নিতে হবে। যার সর্বোচ্চ পরিণতি অকালমৃত্যু। ঠিক যখন মনে হচ্ছিল মানুষের অদম্য প্রাণশক্তি ও কৌতূহল জ্ঞানের ভাণ্ডার আয়ত্তাধীন করে ফেলেছে, ঠিক সে সময়েই চীনের উহান শহর থেকে আসা এই মারণ ভাইরাস মানুষের মধ্যে সেই অপরিচিত, অজানা সম্পর্কে মানুষের প্রাগৈতিহাসিক আতঙ্ককেই জাগিয়ে তুলল।

গত ১২ মে প্রধামন্ত্রীর ভাষণের আগেই WHO কর্তৃপক্ষ তাদের উল্লেখিত হতাশ পর্যবেক্ষণের কথা তাঁকে অবহিত করেছিলেন কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের ফাঁকে প্রধামন্ত্রীর ‘এই ভাইরাসের সঙ্গে বাঁচার কৌশল আমাদের রপ্ত করতে হবে’ কথাটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, হয়তো তিনি অবগত ছিলেন। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার, WHO এই করোনাজনিত বিশ্বব্যাপী সর্বাত্মক হতাশা ও গোটা সমাজের মানসিক স্বাস্থ্যের যে অবনতির ইঙ্গিত দিয়েছে এবং তজ্জনিত যে নেতিবাচক পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে চলেছে তাতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে তিনি এই করোনা আক্রান্ত বিশ্বে ভারতের কর্তব্য ও ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে যথাযথ পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করছেন। হ্যাঁ, তাঁর নিদানগুলি যে নিতান্তই অলখ বা ভগবান নির্ধারিত বাণী এমনটা ভাববার কোনো কারণ নেই। প্রতিদিনের পরিস্থিতি নির্ভর অনেক কিছু অদলবদল সেখানে হতেই পারে। তার কারণ তো একটাই যাতে সরকার মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে আসতে পারে। আজকের এই সময়ে মানুষ দিশেহারা, তারা একটি নির্দিষ্ট গতিমুখের সন্ধানে অধীর। তারা হাতড়ে বেড়াচ্ছে আশা-আশ্বাসের পথ যদি কোনো আংশিক নিশ্চয়তার হদিস পাওয়া যায়। এমন একটি চূড়ান্ত অস্থির সময়ে প্রধানমন্ত্রী অন্তত সামনের পথে হাঁটার কিছু দিক নির্দেশ এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা জাতির সামনে রেখেছেন। যে কোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মানুষ নির্ণায়ক, দৃঢ় নেতৃত্ব প্রত্যাশা করে। মোদী সেই উচ্চতায় উঠতে পেরেছেন।

তাঁর পরিকল্পনা তৈরির মূলে রয়েছে দেশবাসীর প্রতিজ্ঞা ও ধৈর্যশীলতার প্রতি অগাধ আস্থা। যার প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল এই মহামারী জনিত যে টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি হয় তার সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে। দীর্ঘ পর্যায় ধরে লকডাউনের আবহে মানুষের দুর্দশা ও কষ্ট বহুক্ষেত্রে অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। বহুক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় আতঙ্ক ও ভয়। বিশেষ করে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছে ও একই সঙ্গে সেখানেই আটকে পড়েছে, তারাই অবর্ণনীয় কষ্টের শিকার হয়েছে। তবুও আমাদের মতো দেশের বিশাল আয়তন সাপেক্ষে যে বিপুল কর্মকাণ্ড চূড়ান্ত দ্রুততার সঙ্গে সফল করার দরকার ছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সামগ্রিক প্রচেষ্টা ছিল সর্বার্থে অভিনন্দনযোগ্য। একথা সত্যি বহু ক্ষেত্রে বদমেজাজি আচরণ লক্ষ্য করা গেছে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে। এটি দুঃখজনক নিঃসন্দেহে। তবুও গত ১৬ মে-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৮৬৬৭৮ জন সংক্রামিত ও ২৭৬০ জনের মধ্যে মৃতের সংখ্যাকে আটকে রাখার নজির কৃতিত্বের পরিচয়ই বহন করে। ভারত সম্পর্কে পাশ্চাত্যের কিছু সদা-সন্দেহপ্রবণ তথাকথিত পণ্ডিত ধরে নিয়েছিলেন যে, অতীতের নানা দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরগুলির মতো এবারের গণ-মৃত্যুর মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। তাঁরা এখনও পর্যন্ত যোগ্য জবাব পেয়েছেন। হ্যাঁ, তাঁদের অনুমান সত্য হতে পারে যদি মানুষ ১৮ মে'র পর উপযুক্ত বিধিবিধান না মেনে চলে।

দ্বিতীয়ত, ভারত অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলায় যে খাড়া হয়ে যোগ্য জবাব দিতে পারে বিশ্বের অন্য দেশগুলির কাছে এই উপলব্ধি তাদের আগামীদিনে ক্রমাগত স্বার্থপর করে তুলবে। আমেরিকা তার আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের ভূমিকা থেকে কিছুটা সরে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপের দেশগুলি ভিন্ন ভিন্ন সুর-বিরোধী দিশায় চলছে। অন্যদিকে চীনের ক্ষমতা একটা ভীতিপ্রদ তাৎপর্য নিয়ে এগোচ্ছে। সামগ্রিক বিশ্বায়নের রূপ কল্পনা বা ধারণা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এমনকী পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতেও ভারতীয় কর্মীদের যে সুযোগ এতদিন ছিল তাও সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। এর ফলে এই সমস্ত দেশ থেকে ভারতে যে টাকার আগমন হতো তার স্রোত বন্ধ হতে চলেছে। এই বিশ্ব পরিস্থিতির পটভূমিতে ভারতের কাছে নিজের সামর্থ্য বাড়ানো ও পক্ষান্তরে দেশের অভ্যন্তরেই ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা বাড়ানোই একমাত্র পথ। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে,এটি দেশকে বহির্বিশ্ব থেকে গুটিয়ে নেওয়ার নিদান। পক্ষান্তরে, এই নীতির অভ্যন্তরেই রয়েছে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী বিচক্ষণতার সঙ্গে নিজেকে তৈরি করা যাতে কারুর অপার করুণার ওপর নির্ভরশীল হয়ে বা নিতান্ত অধস্তন সুলভ তাঁবেদারি করে দেশকে টিকে থাকতে না হয়। অবশ্যই মোদীর বিধানগুলি খোলাখুলিভাবেই জাতীয়তাবাদ-নির্ভর ও একই সঙ্গে প্রযুক্তিনির্ভর। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই জাপানের সঙ্গে তুলনা উঠবে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব জাপানে যে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন হয়েছিল তাতে যে সামরিক প্রয়োগ কুশলতা ছিল, ভারতে কখনই তা থাকবে না। ভারতের সমস্ত প্রায়োগিক দিকগুলিই নিয়ন্ত্রিত হবে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় ও ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগে।

এই অনিশ্চিত বিশ্বের পৃষ্ঠভূমিতে ভারতের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। সেই কারণে তাকে সামলানো ও সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও হবে সাবধানী ও সূক্ষ্ম। কিন্তু এর সঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জও উড়িয়ে দেওয়ার নয়। প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর লক্ষ্য সফল করতে গেলে বা নিদেনপক্ষে তার কাছাকাছি আসতে গেলেও দেশের মানুষকে সেইভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে। যাতে তারা পূর্ণ মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে। একাজটা করতে গেলে প্রথমেই চিন্তাধারার শ্লথতা ও গোঁড়ামি ঝেড়ে ফেলতে হবে। লাল সুতোর আমলাতান্ত্রিক ফাঁস ও একইসঙ্গে নেতিবাচকতার কোনো স্থান থাকবে না। আর এই বস্তুগুলির প্রাধান্যের ফলেই ভারত তার সম্ভবনার পূর্ণ বিকাশ কোনো দিনই করতে পারেনি। তাই বলছি, এই চ্যালেঞ্জ একাধারে অর্থনৈতিক, মানবিক ও বৌদ্ধিক স্তরে মোকাবিলা দাবি করে। বিশ্বের উদ্যোগপতিদের কেবল 'ভারতে উৎপাদন করো' বলে আবাহন করে আনলেই হবে না, তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমাদের ভারতে তৈরি জিনিসের উৎকর্ষের জন্য যেন গর্বও জন্মায়।

*(লেখক বিশিষ্ট নিবন্ধকার ও রাজ্যসভার সদস্য)*

# লক ডাউনের অন্য দিক

## প্রকৃতির পরিবর্তন

**গৌতম কুমার মণ্ডল**

আর্থিক ক্ষেত্রে ভারতের মতো একটি বিরাট দেশের ক্রমশ বাড়তে থাকে লকডাউন সমূহ ক্ষতি করছে ও করেছে তা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। বহু মানুষ এই বিপর্যয়ে তাঁদের জীবিকা হারিয়েছেন। আর জীবিকা হারানোর যে কী বেদনা তা যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরাই জানেন। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছোট ছোট কলকারখানার অজস্র কর্মচারী, টোটো-ভ্যান-রিকশাচালক, মুটে, মজুরদের মতো কয়েক লক্ষ অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষ, সরকারি নানান কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ---তাঁদের জীবিকা হারিয়েছেন। আর মানুষকে নিয়েই তো সরকার। ফলে সরকার হারিয়েছে তার রাজস্ব। এই বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য সরকারকে তার সঞ্চিত অর্থ বিপুল হারে খরচ করতে হচ্ছে। ফলে রাজকোষ কমে আসছে। রাজার বিপর্যয়ে প্রজারা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে? না, পারে না। রাজ্য যেমন প্রজাকে দেখেন, তেমনি রাজার বিপদের সময় প্রজাকেও রাজার পাশে এসে দাঁড়াতে হয়। মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্ম আপৎকালে রাজার কর্তব্য সম্পর্কে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—“আর দেখ, রাজা ও রাজ্য ইহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে; অতএব রাজা যেমন আপৎকালে স্বীয় ধন ব্যয় করিয়া রাজ্যরক্ষা করেন, তদ্রূপ রাজ্যস্থ প্রজাগণেরও রাজার বিপৎকালে তাঁহাকে রক্ষা করা কর্তব্য।” (মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, শীল সংস্করণ, ২০১৭, পৃ: ৭৩১)। ফলে কী রাজ্য কী কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকদের কাছ থেকে এই সময় সাহায্য চাইছে। আমাদের সক্ষম নাগরিকদের উচিত যা কিছু সম্ভব তা দিয়ে সরকারকে সাহায্য করা।

এত গেল আর্থিক ক্ষতির দিক। এই বিপদের অন্য দিকও আছে। নানাভাবে এই বিপদকে দেখা হচ্ছে ও দেখা উচিত। দেখতেই হবে, কারণ শেষ পর্যন্ত এই বিপর্যয়ের হাত থেকে সভ্যতাকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং তা নিশ্চতভাবেই সম্ভব হবে। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে খুব শীঘ্র এই কোভিদ-১৯ থেকে বেরিয়ে আসা আমাদের পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়। একে সঙ্গী করেই হয়তো আপাতত আমাদের পথ চলতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক আধিকারিক একদিন বলছিলেন এই ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য মূলত আমাদের জীবনশৈলীতে পরিবর্তন আনা দরকার। যেভাবে জীবন চলছিল, এই থমকে যাওয়া সময়ে সেই জীবনের দিকে একবার ফিরে তাকাতে হবে। দেখতে হবে এভাবে কি চলা যায়, না চলা উচিত?

জীবনশৈলী বলতে কী বোঝায়? সাধারণভাবে তা জীবনযাপন প্রণালী। জীবনকে কেমনভাবে আমরা দেখব, কেমনভাবে যাপন করব কয়েক বছরের জীবন—তাই জীবনশৈলী। জীবন তো এই বিরাট পরিবেশের একটি অংশমাত্র। প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন চলতে পারে না। মহাবিশ্বের অন্তহীন কালপ্রবাহে এই জীবন একটি বিন্দুমাত্র। এই বিন্দুতেই যদি সিন্ধুদর্শন করতে চাই তাহলে প্রকৃতিকে অবহেলা করলে চলে না। আমাদের প্রতিটি ধর্মগ্রন্থ একথা বলেছে, বলেছেন পৃথিবীর গুণীজনেরা, শিল্পী ও কবিগণ। প্রকৃতির কথা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ থেকে ওয়ার্ডস ওয়ার্থ সব শূন্য হয়ে যায়। কিন্তু দিনে দিনে আমরা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলাম। পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষার জন্য বড়ো বড়ো সভা সমাবেশ হয়, বিশ্বনেতারাও এক টেবিলে গ্লোবাল ওয়ামিং নিয়ে আলোচনা করেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা অষ্টরম্ভা। কলকারখানা থেকে নির্গত পুঞ্জ পুঞ্জ কালো বা কখনো সাদা ধোঁয়ার পরিমাণ বাড়তেই থাকে, নগর ও শিল্পক্ষেত্রের বর্জ্য নদীর জলধারাকে দূষিত করতেই থাকে, কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বাড়তেই থাকে, আর আগুন লাগে আমাজন থেকে অস্ট্রেলিয়ার বনভূমিতে। মানুষের বিষবাষ্পে ত্রাহি ত্রাহি রব তোলে প্রাণীজগৎ। প্রকৃতিকে বিনাশ করে মানুষের এই যে জীবনযাপন এর পরিবর্তন দরকার। এই পরিবর্তন সম্ভব মানুষ যদি তার জীবনশৈলীর পরিবর্তন করে।

আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে একটি শব্দ ‘উন্নতি’। সব রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য যেন এই ‘উন্নতি’। ‘উন্নতি’ বলতে কী বোঝায়? পরিবেশের সর্বনাশ করে যে উন্নতি তা কী আদৌ উন্নতি না অবনতি? লকডাউন-উত্তর পরিবেশের শুদ্ধতা আমাদের এই ভয়াবহ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। লাকডাউনের সময় বিদ্যুৎ শিল্পের মতো জরুরি শিল্পগুলি বাদ দিয়ে প্রায় সমস্ত কলকারখানা বন্ধ ছিল। রেড জোন এলাকাগুলিতে এখনো তা বন্ধ। বেঁচে থাকার জন্য তা করতেই হবে। কারণ মানুষের জীবনের মূল্য সবার আগে। তার অর্থনীতি, শিক্ষা, আইন-আদালত সবকিছু। জীবন বাঁচানোর স্বার্থেই রাষ্ট্র আমাদের ঘরে আবদ্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু গৃহের ছাদ থেকে, বাড়ির সামনের রাস্তা থেকে বা বাড়ির অঙ্গন থেকে আমরা দেখছি পরিবেশের শুদ্ধতা। খালি চোখেই এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কোনো যন্ত্রপাতি লাগছে না। বৈশাখ মাস চলে গেল। আমরা সে রকম গরম অনুভব করলাম না। দু' একদিন ছাড়া ছাড়াই কালবৈশাখীর দমকা হাওয়া আর বৃষ্টি প্রকৃতিকে সুখস্নানে ভরিয়ে দিয়ে গেল। বাঙ্গলার রাঢ় অঞ্চলের ভৌম জলস্তর এখনো তেমন নেমে যায়নি। সকালে পাখপাখালির কিচিরমিচির একটু বেশিই শোনা যাচ্ছে। এমনকী যে কাক পক্ষীদের দেখাই পাওয়া যেত না, বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার আনাচে কানাচে তাদেরও দেখা মিলছে। সেদিন আমার বাড়ির অঙ্গন থেকেই মধ্যাহ্ন আকাশে দেখলাম দুটো চিল উড়ছে। চিল তো প্রায় লুপ্তপ্রায় পাখির তালিকায় নাম তুলেছিল। তাদেরও দেখা পেলাম এই পরিবেশে। এরপর শকুন দেখার অপেক্ষায় আছি। লকডাউন তো চলছে প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে। পৃথিবীর দূষণ অনেকখানি বন্ধ। ফলে আমরা খবর পাচ্ছি মহাকাশের ওজন স্তরের যে ফাটল দেখা দিয়েছিল তাও নাকি এখন পূরণ হয়ে গেছে। এর থেকে বড়ো কথা আর কী-ই হতে পারে।

প্রকৃতির কীরকম সর্বনাশ আমরা করেছি তা এই লকডাউনে প্রকৃতির ছবি দেখলেই বোঝা যায়। প্রকৃতিকে রক্ষা করে যে উন্নতি, যাকে বলা হয় 'Sustainable Development' তা আমরা করতে পারছি না। এ সম্পর্কে বহু আলোচনা সভার আয়োজন হয়েছে কিন্তু বাস্তবের ফল প্রায় শূন্য। গান্ধীজী থেকে রবীন্দ্রনাথ ভারতের এই দুই গুণী মানুষ প্রকৃতির বিনাশ করে কোনো উন্নয়ন চাননি। এটা চলতে থাকলে প্রকৃতি যে একদিন প্রতিশোধ নেবেই তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ প্রকৃতির সমস্ত অনু-পরমাণু একটা শৃঙ্খলে বাঁধা। এই বন্ধন টুটলেই বিনাশ অনিবার্য। এই ভয়াবহ রোগকে মানব সভ্যতার ওপর প্রকৃতির প্রতিশোধ হিসেবে দেখা যেতেই পারে। প্রকৃতি নিজেই যেন নিজের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য এগিয়ে এল। উন্নতির নেশায় ধাবমান মানুষকে কিছুদিনের জন্য থামতে বলল। করোনা ভাইরাস যেন একটি উপলক্ষ্য মাত্র। মৃত্যু আর বিনাশের ভয়াল বার্তা হাতে নিয়ে প্রকৃতিই যেন আমাদের জানাতে চাইছে সভ্যতা ঠিক পথে চলছে না। সভ্যতাকে সে জানিয়ে দিল 'শুধরাও, নইলে পতন অবশ্যম্ভাবী'।

যে বিনাশকারী উন্নয়নের দিকে আমরা চলেছি তার জন্য কেন্দ্র থেকে রাজ্য সরকার তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। প্রতিটি সরকারের পরিবেশ দপ্তর প্রায় নখদন্তহীন। এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে কলকারখানার মাত্রাতিরিক্ত দূষণ ধরে ফেলা সহজ হয়েছে। কিন্তু কোনো রহস্যময় কারণে তা বাস্তবে প্রয়োগ হয় না। এ রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এখন তো তার সমস্ত কার্যক্ষমতা বিসর্জন দিয়ে বসে আছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান জুড়ে স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলির মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কথা সবাই জানেন। জানে না শুধু দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। প্রতিনিয়ত এই কারখানাগুলি এলাকার জল-হাওয়া-মাটি নষ্ট করে দিচ্ছে। পর্ষদে এদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ জমা পড়ে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। আমরা সবাই জানি প্লাস্টিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সরকার আমাদের একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে। গত বছরের ২ অক্টোবর থেকে রেল চত্বরে এই ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। এ বিষয়ে কিছু পোস্টার লাগিয়েই রেল তার দায়িত্ব থেকে যেন মুক্ত হয়েছে। আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখি সাধারণ মানুষের এ সম্পর্কে কোনো সচেতনতা নেই। তাই কাজের কাজ তেমন কিছু হয়নি। এ রাজ্যের পৌরসভাগুলিও একাজে চূড়ান্ত ব্যর্থ। আসলে পরিবেশের জন্য যেকোনো ভালো কিছু করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নীচু স্তরে চূড়ান্ত উদাসীনতায় পরিণত হয়। সরকার যে কোনো সময় একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক, গুটকা, পানমশলার কারখানাগুলিকে বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু সামান্য কিছু রাজস্ব আর কিছু কর্মসংস্থান হারানোর ভয়ে সরকার পরিবেশের লাগাতার ক্ষতি মেনে নেয়। এইসব বিষয় নিয়ে আন্তরিকভাবে ভাবার সময় এসেছে। পরিবেশের কথা সবার পিছনে রেখে উন্নয়ন নয়, পরিবেশের কথা সবার আগে রেখে উন্নতির কথা ভাবতে হবে। লকডাউনের জন্য শুদ্ধতর পরিবেশ আমাদের সেই বার্তা দিয়ে গেল।

কিন্তু এই বার্তা কি সরকার শুনবে? করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহ আবহের মাঝেই প্রধানমন্ত্রী গত ১২ মে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। এই ভাষণে তিনি আত্মনির্ভর ভারত গঠনের কথা বললেন। স্থানীয় চাহিদা ও জোগানের মাধ্যমে জীবনযাপন, লোকালের জন্য ভোকাল হওয়া, আর তারপর ২০ লক্ষ কোটি টাকার এক বিরাট আর্থিক প্যাকেজের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন আত্মনির্ভরতা সুখ দেয়। কিন্তু প্রকৃতিকে বিনাশ করে আত্মনির্ভরতা আসে না। আমরা আমাদের কৃষিক্ষেত্রে নিজের বাড়ির জৈব সার ব্যবহার না করে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার যদি ব্যবহার করি, তাহলে ফসল ফলাতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর হতে পারলাম না। পরিবেশ রক্ষার জন্য এরকম কিছু ছোট ছোট বিষয় আমরাও যদি মেনে চলি তাহলে অনেক কাজ হয়। সবকিছু সরকার করে না। কিন্তু অবশ্যই সরকারকে পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে নীতি নির্ধারণ করতে হবে এবং দৃঢ়ভাবে তার রূপায়ণ করতে হবে।

করোনার ভয়ে দেশ জুড়ে লকডাউন আমাদের অনেক কিছু কেড়ে নিল সত্যি কথা। কিন্তু এর উলটো পিঠে কিছু ভালো দিকও আমরা পেলাম। দীর্ঘ লকডাউন আমাদের সুন্দর প্রকৃতি দিল। দিল্লির বায়ুদূষণ গোটা পৃথিবীর আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। শহরটা আর বাসযোগ্য থাকবে কিনা এই প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু বহু কিছু হারিয়েও দিল্লির পরিবেশ এখন পালটে গিয়েছে। এছাড়া এই লকডাউনে আমরা জানলাম কত কম জিনিস নিয়েও বাঁচা যায়! ভোগ্যপণ্য জীবনকে ক্রমশ পণ্যনির্ভর করে তুলেছিল। তা থেকে কিছুদিনের জন্য আমরা বেরিয়ে এলাম। লকডাউন আমাদের শেখাল প্রযুক্তির এই যুগে ঘরে বসেও অনেক কাজ করা যায়। বেশি দৌড়ঝাঁপ, টার্গেটের পিছনে দৌড়তে দৌড়তে জীবনে অনাবশ্যক চাপ বা স্ট্রেস ডেকে আনা, বাইরের কাজে ঘুরতে ঘুরতে নিজের পরিবারকেই দেখতে ভুলে যাওয়া—এসব যে প্রকারান্তরে নিজের শরীর ও মনের ক্ষতি ডেকে আনে তা আমরা বুঝলাম। সবার হাতে প্রযুক্তির কিছু সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এখন যেন সময়ের চাহিদা। অন লাইনে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু ক্লাস দেখলাম, তা থেকে মনে হলো স্কুলের ক্লাসরুমের সঙ্গে সঙ্গে এইসব ক্লাস ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চলতেই থাকুক। অন লাইন ক্লাস যেন লকডাউন উত্তর সময়ে বন্ধ হয়ে না যায়।

এছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা, করোনার ভয় আমাদের শেখাল কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হয়। নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা, বাইরে থেকে বাড়িতে এলে অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত পা ধুয়ে বাড়িতে প্রবেশ করা, যত্রতত্র থুতু না ফেলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখা—এসব সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি আমরা অনেকেই মেনে চলতাম না। এসব স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে অনেক রোগ থেকেই আমরা বাঁচতে পারি। তাই দীর্ঘ দিনের লকডাউন আমাদের অনেক কিছু কেড়ে নিলেও অনেক কিছু দিয়ে গেল। ■

# হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি

**প্রবাল**

আরে দাদা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি কি একজন নাকি? বাঙ্গালি কি প্রতিভায় এতটাই দীন? বঙ্গভূমি হলো প্রতিভার নন্দনকানন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, নাকি রাসবিহারী বসু? বাঘা যতীন, নাকি মাস্টারদা? শ্রীরামকৃষ্ণ, নাকি স্বামী বিবেকানন্দ? জগদীশচন্দ্র বসু, নাকি সত্যেন বসু? জয়দেব, নাকি রবীন্দ্রনাথ? বঙ্কিম, নাকি শরৎ? অতীশ দীপঙ্কর, নাকি লালন ফকির? কাকে ছেড়ে কাকে ধরি? তবুও দেখুন, বিবিসি বাংলা ফস করে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালির প্রতিযোগিতা করে বসল, আর সেই প্রতিযোগিতায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ঘোষিত হলেন মুজিবুর রহমান। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে আজকাল বাঙ্গালি শব্দটাই লোগমেলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাঙ্গালির প্রিয় উৎসব দুর্গাপূজা নয়, ইদ-উল-ফিতর। বাঙ্গালির প্রিয় খাদ্য মাছ নয়, গোস্ত! কোনোদিন বলবে, বাঙ্গালির পোশাক ধুতি নয়, আরবি আলখাল্লা! বাঙ্গালি হওয়ার সংজ্ঞাটাই তো বদলে দিচ্ছে এরা! এসব দেখে সন্দেহ হচ্ছে, আমি সত্যিই বাঙ্গালি তো?

যাক গে যাক! যে যা করে করুক, আমার মনে আমি ১০০ শতাংশ খাঁটি বাঙ্গালি। তাই বিবিসি যাক চুলোর দোরে, আমার মতো করে আমি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি নির্বাচিত করতে চাই। যে কোনো নির্বাচনেই কিছু প্রাথমিক নিয়ম ঠিক করতে হয়। আমার এই নির্বাচনে প্রাথমিক নিয়ম হলো বাবার চেয়ে ছেলেকে বড়ো দেখানো চলবে না। যেমন শরৎচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন রবিঠাকুরের কাঁধে, রবিঠাকুর আবার দাঁড়িয়ে আছেন বঙ্কিম-জয়দেব-বিদ্যাপতির কাঁধে। শরৎচন্দ্রকে মান দিতে গিয়ে তাঁর পূর্বসূরীদের যেন অপমান না ঘটে! গোড়ায় যেতে হবে। কিন্তু খুব বেশি গোড়ায় গেলেও চলবে না। যেমন, চর্যাপদ না হলে পদাবলী হতো না। কিন্তু সাধক ভুশুকুপাদের কতটা প্রভাব আজ আছে এই বঙ্গভূমিতে? সেটাও ভারতে হবে। এই গেল প্রথম নিয়ম। দ্বিতীয় নিয়ম হলো অধ্যাত্ম জগৎ থেকেই কাউকে বাছতে হবে। কারণ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ধর্মই আমাদের আত্মা। কবিতা থেকে বিজ্ঞান, সবই তো

অধ্যাত্ম থেকেই অনুপ্রাণিত। বিশ্বাস হয় না? বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি পড়ে দেখুন।

বাঙ্গালি হিন্দুদের মধ্যে মূলত দু'রকম উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে—শাক্ত ও বৈষ্ণব। আধুনিক বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেব। সেই নিরিখে, আধুনিক শাক্তধর্মেরও একজন প্রবর্তক রয়েছেন। তাঁর নাম কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। যাবতীয় প্রচলিত তন্ত্রসাধনার নির্যাস সংগ্রহ করে তিনি 'বৃহৎ তন্ত্রসার' বলে একটা বই সংকলন করেন। মা কালীর আধুনিক রূপকল্পনার তিনিই রূপকার। তন্ত্রশাস্ত্রের তিনিই ব্যাসদেব। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, নিমাই মিশ্র ও কৃষ্ণানন্দ মৈত্র অর্থাৎ চৈতন্যদেব ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ উভয়েই নবদ্বীপের একই চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলেন! পাঁচশো বছর আগে নবদ্বীপের সেই চতুষ্পাঠীতে যে বিপ্লব শুরু হয়েছিল, সেটা বাঙ্গালির আত্মাকে সমূলে বিনাশ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

চৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই বৈষ্ণব আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। কাজিদমন বা রূপ সনাতন যবন হরিদাসেই তা শেষ হয়নি। চৈতন্যের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম আচার্য প্রভুপাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যে পৌঁছয়। আচার্য প্রভুপাদের কৃপাতেই আজ পৃথিবীর এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ সনাতন ধর্মের অনুগামী, যাদের সঙ্গে ভারতের রক্তের সম্বন্ধ নেই দূর দূর পর্যন্ত। কাণ্ড দেখুন—একদিকে কিছু তথাকথিত বাঙ্গালির সন্তান নিজের ধর্মকে বোঝার জন্য মাস্টার রেখে আরবি শিখছে, অন্যদিকে এইসব বিদেশি বৈষ্ণবরা চৈতন্য চরিতামৃত পড়ার জন্য বাংলা শিখছে! বাঙ্গালির আত্মবোধ রক্ষায় চৈতন্যদেবের প্রভাবের এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কী দেবো? ইন্টারনেটে বেশ কিছু ভিডিয়ো আছে, ইস্কনের সন্ন্যাসীরা কীভাবে পৃথিবী জুড়ে চৈতন্যদেবের ধর্মমত প্রচার করছেন, সেই নিয়ে। দেখলাম এঁরা বিভিন্ন গোঁড়া ইসলামিক দেশে ঢুকে পথচলতি লোকজনের হাতে গীতা ধরিয়ে দেন। 'আপনিও এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, আমিও এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। এই গীতা হলো সেই এক ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী!' এই বলে আলাপ জমিয়ে নেন। কৃষ্ণনাম পৌঁছে যায় এমন সব জায়গায়, যেখানে যাওয়ার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আমার কিছু পরিচিত লোকজন আছে, যাদের এখনো বাংলাদেশে আত্মীয়স্বজন আছে। তাদের কাছেই শুনেছি, বাংলাদেশের হিন্দুরা অনেকেই ইসলামিক আগ্রাসন ঠেকানোর জন্য নিজেদের সম্পত্তি ইস্কনকে লিখে দেয়। ইস্কন রাতারাতি সেখানে আশ্রম বানিয়ে সংকীর্তন শুরু করে। জেহাদিরা ভয় পায় ইস্কনকে।

এতো গেল চৈতন্যদেবের কথা। এবার কৃষ্ণানন্দের বা বৃহত্তর রূপে দেখতে গেলে শাক্ত প্রভাবের কথায় আসি। শোনা যায়, মিরকাশেমের জেল থেকে বেরিয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের লক্ষ্য বদলে যায়। বাঙলার অধিকাংশ হিন্দু জমিদারদের সঙ্গেই তাঁর ছিল গভীর সখ্য। এই জমিদারদের নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করে নিজের অবশিষ্ট জীবদ্দশাতেই শারদীয়া দুর্গাপূজার পরম্পরাকে তিনি বাঙ্গালির জনজীবনের অঙ্গীভূত করে ফেলেন। কৃষ্ণানন্দের শিষ্য সাধক রামপ্রসাদ, যিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন, তাঁর প্রভাবে শাক্ত ভক্তি আন্দোলনের যে জোয়ার এল, তার ফলেই আমরা পেলাম রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, অরবিন্দকে। তার থেকেই জন্ম নিল অনুশীলন দল, যুগান্তর, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। স্বাধীনতা পেল ভারত। ভারতের স্বাধীনতা চেতনার মূল স্রোত যে গঙ্গোত্রী থেকে উৎসারিত, সেই বন্দে মাতরম্, সেই দেশমাতৃকার কল্পনা, সেও তো শাক্তধর্ম থেকেই এসেছে।

একটা দিন ছিল, যখন হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী আর গান্ধার থেকে ব্রহ্মদেশ অখণ্ড ভারতবর্ষের কেন্দ্রে ছিল বঙ্গভূমি। আর আজ? বাঙ্গালি আজ কোণঠাসা প্রান্তিক খণ্ডিত এক জনগোষ্ঠী। আজ এখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, এখান থেকে বাঙ্গালির পূর্বগৌরবের পরিস্থিতিতে কী করে ফিরে যাওয়া যায়? যাওয়া যায়, কিন্তু তার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের ভৌগোলিক কেন্দ্রে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ, পুরনো অখণ্ড ভারতের মানচিত্রকে পুনর্জীবিত করতে হবে। অসম্ভব? এককালে মনে হতো, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির মিলন অসম্ভব। আর আজ? আমাদের ধ্যেয়পথের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু বিজাতীয় এক প্রতিবিম্ব। নিজেদের হায়না ভাবা সিংহশিশুদের মনে বিদেশি আক্রমণকারী বিজেতাদের প্রতিবিম্ব এখনো প্রবল। তাই তারা হায়নার দলে মিশে খেউ খেউ ডেকে বেড়ায়। সেই প্রতিবিম্বকে ভাঙতে হবে আরও শক্তিশালী এক বিজয়ীর প্রতিবিম্ব দিয়ে। সেই প্রতিবিম্ব চৈতন্য-কৃষ্ণানন্দের প্রতিবিম্ব। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা সবসময় সঙ্গে একখণ্ড গীতা রাখতেন। বৈষ্ণব ও শাক্ত যখন একসঙ্গে একই উদ্দেশ্যে কাজ করে, তখন কী মহাজাগরণ উপস্থিত হয়, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম তার প্রমাণ।

গোড়ার কথায় আসি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি কে? চৈতন্যদেব ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, এই দু'জনকেই আমি যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করলাম। তবে ঘোষণা করেই দায়ীত্ব থেকে নিষ্কৃতি হচ্ছে না। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীর দুই যুবক নিমাই ও কৃষ্ণানন্দ যে কাজের সূত্রপাত করেছিলেন, প্রয়োজন সেই বিপ্লবকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাতেই সিদ্ধিলাভ হবে বাঙ্গালির! ■